Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে ন্যায়বিচার: আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাসরিন জাহান

রোলঃ 228020984

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে ন্যায়বিচার: আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাসরিন জাহান

রোলঃ 228020984

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে ন্যায়বিচার:আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাসরিন জাহান, আইডিঃ 228020984 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামে ন্যায়বিচার:আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

নাসরিন জাহান

আইডিঃ 228020984

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভুমিকা: 5

ন্যায়বিচার সম্পর্কে ইসলাম কি বলে? 6

ন্যায়বিচার আল্লাহর গুণ : 7

ন্যায়বিচার সম্পর্কিত কিছু হাদিস : 9

সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় কুরআনের নির্দেশ : 12

বর্তমান আধুনিক সমাজে ন্যায়বিচার ব্যবস্থা: 13

বণ্টন মূলক ন্যায় বিচার : 20

ন্যায়বিচারের ধারণা ও প্রকৃতি : 20

ন্যায়বিচার সম্পর্কিত কুরআনের আটটি আয়াত : 21

বিচারক প্রসঙ্গে হাদিস : 24

অসৎ বিচারকের শাস্তি : 26

ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী আইন বিচার : 28

ন্যায়পরায়নতা ও সুশাসন : 34

ইসলাম ন্যায়বিচার সম্পর্কে যেমন কথা বলে : 36

ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ : 40

ন্যায় বিচারের প্রতিদান : 42

সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার উপকারিতা : 44

শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ন্যায়বিচার : 48

মানুষের সৃষ্ট আইন দ্বারা কি সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়? 57

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার কল্যাণকামীতা: 62

ন্যায়বিচার ব্যবস্থার সাক্ষাদান: 73

উপসংহার : 83

ভুমিকা:

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ المُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ: الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وأَهْلِيْهِم وَمَا وَلُوْا». رواه مسلم

বাংলা অনুবাদ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় ন্যায় বিচারকরা আল্লাহর নিকট জ্যোতির মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। যারা তাদের বিচারে এবং তাদের গৃহবাসীদের মধ্যে ও যে সমস্ত কাজে তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে, তাতে তারা ইনসাফ করে' [মুসলিম ১৮২৭, নাসায়ি ৫৩৭৯, আহমদ ৬৪৪৯, ৬৪৫৬, ৬৮৫৮]

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলাম অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহপাক হচ্ছেন সবচেয়ে বড় ন্যায়বিচারক। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যেহেতু আল্লাহরই কাজ, তাই শাসনকার্যে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহপাক এ নির্দেশই প্রদান করেন, তারা যেন ন্যায়পরায়ণতা, দক্ষতা এবং নিরপেক্ষতার সাথে নিজেদের কর্তব্য পালন করেন।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে তোমরা দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, এমনকি সেই সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও। যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে, সে ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ্ উভয়েরই সর্বোত্তম অভিভাবক। অতএব তোমরা যাতে ন্যায়বিচার করতে সক্ষম হও, সেজন্য তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না আর তোমরা যদি পেঁচানো কথা বল অথবা সত্য এড়িয়ে যাও, তবে মনে রেখো, তোমরা যা কর সে বিষয়ে নিশ্চয় আল্লাহ পুরোপুরি অবগত আছেন' (সুরা নিসা: ১৩৫)।

এ আয়াতে শুধুমাত্র সুবিচারের কথাই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়নি, বরং সুবিচার প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য শর্তাবলীও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, শুধুমাত্র সুবিচার প্রতিষ্ঠাই নয়, বরং সুবিচারের পতাকাকেও সমুন্নত রাখতে হবে। যেখানেই ন্যায়বিচার ভূলুণ্ঠিত হতে দেখা যাবে, সেখানে তা সমুন্নত করাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। মামলায় কোনো পক্ষের হার-জিতের জন্য সাক্ষ্য নয়, বরং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই সাক্ষ্য দিতে হবে। কেননা, সত্যসাক্ষ্য ব্যতিরেকে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সত্যসাক্ষ্য

দিতে গিয়ে যদি নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে অথবা নিজ পিতা-মাতার বা নিকটাত্মীয় পরিজনের প্রতিকূলেও যদি যায়, তবুও সত্যসাক্ষ্য দিতে হবে।

আল্লাহ তায়ালার সকল কাজ ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ"؛"
[قرآن :آل عمران، ١٨]

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, ফেরেশতাগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণও (এই একই বিষয়ে) সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, [আল্লাহর সকল কাজ] ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই।" [আলে-ইমরান, ১৮]

ন্যায়বিচার সম্পর্কে ইসলাম কি বলে?

ন্যায়বিচার ইসলামের অন্যতম মূলনীতি। রাষ্ট্র পরিচালনায় সবার প্রতি সমান আচরণ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা আবশ্যক; ধনী-গরিব, শক্তিশালী-দুর্বল সবার জন্য প্রযোজ্য। ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা রক্ষাই হলো বিচারের মূল উদ্দেশ্য।
পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

اِنَّ اللّٰهَ يَاۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰۤی اَهۡلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمۡتُمۡ بَیۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا یَعِظُكُمۡ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِیۡعًۢا بَصِیۡرًا

অর্থ: আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করো, তখন ন্যায়বিচার করো। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উত্তম উপদেশ দান করছেন। (সুরা নিসা, আয়াত: ৫৮)
আরেক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ یَاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ وَ الۡاِحۡسَانِ وَ اِیۡتَآیِٔ ذِی الۡقُرۡبٰی وَ یَنۡهٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَ الۡمُنۡكَرِ وَ الۡبَغۡیِ ۚ یَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُوۡنَ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘন করা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন; যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। (সুরা নাহল, আয়াত: ৯০)

উপর্যুক্ত আয়াতটি যারা বিচারকার্য পরিচালনা করেন, তাদের সঠিকভাবে বিচার করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর এ হচ্ছে, কোরআনের ভাষায় উত্তম উপদেশ। তাই ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। আমাদের সমাজে যারা পারিবারিক ও বিভিন্ন ছোটখাটো বিষয়েরও বিচারক হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় বিচারকের ভূমিকা পালন করেন, তাদেরও এখান থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য।

ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কখনো কোনো পক্ষের প্রতি ঝুঁকে পড়া উচিত নয়।

ন্যায়বিচার আল্লাহর গুণ :

ইসলামে ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামি বিধান মতে, বিচারক ও সাক্ষ্যদাতা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে চলবে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনরা! আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থেকো। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করো—এটি আল্লাহভীতির নিকটতর। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে খবর রাখেন।' (সুরা মায়েদা: ৮)

ন্যায় বিচার স্বয়ং আল্লাহ তাআলারই অন্যতম একটি গুণ। তিনি জমিনে তার প্রতিনিধিকেও ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, 'হে দাউদ! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে যথাযথভাবে বিচার করো।' (সুরা সোয়াদ: ২৬)

ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকের অনন্য মর্যাদা দান করেছে ইসলাম। কেননা ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক সমাজে অবিচারের পরিবর্তে সুবিচার, অপরাধের পরিবর্তে শৃঙ্খলা, অন্যায়ের পরিবর্তে

ন্যায়, মন্দের পরিবর্তে ভালো প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'যখন তুমি বিচার করো, তখন তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে ফায়সালা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠদের ভালোবাসেন।' (সুরা মায়েদা: ৫)
ইসলাম যেমন বিচারকের জন্য পুরস্কার ও মর্যাদা ঘোষণা করেছে, তেমনি বিচারকদের সতর্কও করেছেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যাকে মানুষের মধ্যে বিচারক বানানো হলো, তাকে ছুরি ছাড়া জবাই করা হলো।' (তুহফাতুল আহওয়াজি: ৪/৫০৫)

হাদিসে রাসুল (স.) বলেন, 'বিচারক তিন প্রকার। এক প্রকার বিচারক জান্নাতি আর অপর দুই প্রকার বিচারক জাহান্নামি। জান্নাতি হলো সেই বিচারক, যে সত্যকে জেনে-বুঝে সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে। আর যে বিচারক সত্যকে জানার পর বিচারে জুলুম করে সে জাহান্নামি এবং যে বিচারক অজ্ঞতাবশত ফায়সালা দেয় সেও জাহান্নামি।' (আবু দাউদ: ৩৫৭৩)
মনে রাখতে হবে, একটি সুন্দর সমাজের মেরুদণ্ড শক্তিশালী থাকে ন্যায় বিচারের ওপর। আর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে আল্লাহর বিধান। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় আমি আমার রাসুলদেরকে নিদর্শনাদি দিয়ে প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে নাজিল করেছি কিতাব ও মাপার পাল্লা, যেন মানুষ ন্যায় বিচার কায়েম করতে পারে।'(সুরা হাদিদ: ২৫)

অন্যত্র তিনি বলেন, 'যদি মুসলমানদের দুদল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে , তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি ওদের একদল অন্য দলের উপর চড়াও হয় তাহলে তোমরা সকলে সেই চড়াওকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তবে উভয় দলের মাঝে ন্যায়ের সঙ্গে বিচার করে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন।' (সুরা হুজরাত: ৯)
সহিহ বুখারিতে এসেছে নবী কারিম (স.) বলেন, সাত শ্রেণির লোক হাশরের ময়দানে আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে। প্রথম শ্রেণি হচ্ছেন ন্যায়পরায়ণ শাসক। (বুখারি: ১৪২৩; মুসলিম: ১০৩১)

ন্যায়বিচার যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলোও জটিল। কোরআনের ভাষায় মৌলিকভাবে দুটি কারণে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত হয়। সেগুলো হলো- স্বজনপ্রীতি ও ভালোবাসা।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন, ‘হে ইমানদারগণ! তোমরা ইনসাফের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাকারী, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য প্রদানকারী হয়ে যাও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা (তোমাদের) মাতাপিতা ও আত্মীয়স্বজনের বিপক্ষে হয়। অতএব তোমরা ইনসাফ করার বিষয়ে অন্তরের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না।’ (সুরা নিসা: ১৩৫)
উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদানকারী ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি নিজেদের বা পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়ের বিপক্ষে গিয়েও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হয় তা-ও করতে হবে। মুফাসসিরগণ বলেন, একথা বলার কারণ হচ্ছে, মানুষকে সতর্ক করা। কারণ, এদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়েই মানুষ ইনসাফের পথ থেকে বিচ্যুত হয়। এখানে কিছু শ্রেণির কথা উল্লেখ করে মূলত পারস্পরিক সম্পর্কের কথাই তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ সম্পর্কের কারণে মানুষ ইনসাফের পথ থেকে সরে আসে, যাকে স্বজনপ্রীতি বলা হয়।

ন্যায়বিচার সম্পর্কিত কিছু হাদিস :

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন...। (সূরা নাহল ৯০)

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

অর্থাৎ, সুবিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। (সূরা হুজুরাত ৯)

আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ আযযা অজাল্লার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালোবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালোবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' সেই ব্যক্তি যে দান ক'রে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।

(বুখারী ৬৬০, ১৪২৩, ৬৮০৬, মুসলিম ২৪২৭)

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

)১৭৯৬) আমর বিন আস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিচারক যদি সুবিচারের প্রয়াস রেখে বিচার করে অতঃপর তা সঠিক হয়, তবে তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। আর সুবিচারের প্রয়াস রেখে যদি বিচারে ভুল করেও বসে, তবে তার জন্যও রয়েছে একটি সওয়াব।

(বুখারী ৭৩৫২, মুসলিম ৪৫৮৪)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ

)১৭৯৯) উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তো একজন মানুষ মাত্র। আর তোমরা আমার নিকট বিচার নিয়ে

আসছ। সম্ভবতঃ তোমাদের কেউ কেউ একে অন্যের চাইতে দলীল ও প্রমাণ পেশকরণে অধিক পারদর্শী। ফলে আমি তার নিকট থেকে আমার শোনা মতে তার সপক্ষে ফায়সালা দিয়ে তার ভাইয়ের কিছু হক তাকে দিয়ে দিই, তাহলে সে যেন তার কিছুই গ্রহণ না করে। যেহেতু আমি তো (এ অবস্থায়) তার জন্য (জাহান্নামের) আগুনের একটি অংশ কেটে দিই।

(বুখারী ২৬৮০, ৬৯৬৭, ৭১৬৯, মুসলিম ৪৫৭০)

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ

)১৮০০) আবূ উমামা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের কসম দ্বারা কোন মুসলিমের অধিকার হরণ করে, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ দোযখ ওয়াজেব এবং জান্নাত হারাম করে দেন। লোকেরা বলল, 'যদিও সামান্য কিছু হয় তাও, হে আল্লাহর রসূল!' বললেন, যদিও বা পিল্লু (গাছের) একটি ডালও হয়।

(মালিক, মুসলিম ৩৭০, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২৩২৪)

عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(১৮০২) খাওলা আনসারিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, তিনি শুনেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় কিছু লোক আল্লাহর মাল নাহক ব্যয়-বন্টন করবে। সুতরাং তাদের জন্য কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন রয়েছে।

(বুখারী ৩১১৮)

সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় কুরআনের নির্দেশ :

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, ইরশাদ হয়েছে, 'হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে তোমরা দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, এমনকি সেই সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও। যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে, সে ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ্ উভয়েরই সর্বোত্তম অভিভাবক।

মহান আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। -(সুরা মায়োদা: ৮)

আরও বর্ণিত হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে কোনো বিচার-ফয়সালা কর, তখন ইনসাফভিত্তিক ফয়সালা কর। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সদোপদেশ দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শোনেন এবং দেখেন।' -(সুরা নিসা : ৫৮)

অন্য সুরায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচার, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অপছন্দনীয় কাজ এবং অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। -(সুরা আননহল : ৯০)

আল্লাহ আরও বলেছেন, 'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার করো এবং খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়েছে।' -(সুরা-৩৮ সদর, আয়াত: ২২ ও ২৬)

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও আজীবন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি কখনো স্বগোত্রীয় মানুষের পক্ষপাতিত্ব কিংবা স্বজনপ্রীতি দেখাননি; বরং

প্রতিটি মুহূর্ত নিজের কর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে সাহাবাদের মাঝে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

ওসামা নবী (সা.)-এর সঙ্গে কথা বললেন। নবী (সা.) বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনকারিণীর সাজা মওকুফের সুপারিশ করছ? অতঃপর নবী (সা.) দাঁড়িয়ে খুতবায় বললেন, তোমাদের আগের জাতি এ কাজই ধ্বংস করেছে যে যখন তাদের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট অভিজাত লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অন্যদিকে যখন কোনো অসহায় গরিব সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার ওপর দণ্ড জারি করত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মদ (সা.)-এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করত; তাহলে আমি তাঁর অবশ্যই (দণ্ডবিধি অনুসারে) হাত কেটে দিতাম। -(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৪৭)

বর্তমান আধুনিক সমাজে ন্যায়বিচার ব্যবস্থা:

ন্যায়বিচার যার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মুসলমানদের আইডল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর কাছ থেকে। বর্তমানে ন্যায় বিচার শুধু নামেই রয়েছে কিন্তু কাজে দেখা যায় এক বিশাল তফাৎ। মানুষ যেখানে অর্থের পিছনে ছুটছে সেখানে ন্যায় বিচার পাওয়াটা দুষ্কর। স্বার্থন্বেষী এই দুনিয়ায় ন্যায়বিচার পাওয়াটা যেন পরশপাথরের ছোঁয়া। রাষ্ট্র,সমাজ,পরিবার কোথাও এর পরিপূর্ণ প্রয়োগ নেই। এর কারণেই জালিম তার জুলুমের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে আর মজলুম নিপীড়িত,নির্যাতিত হচ্ছে বারংবার। রাষ্ট্রীয় যেকোনো কাজে আপনি যাবেন দেখবেন সেখানে রয়েছে সুদ-ঘুষের ছড়াছড়ি, যদি আপনি অর্থবান এবং ক্ষমতাধর হন তাহলে আপনি সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবেন।গরিবরা যেন জন্মেছেই নিপীড়িত এবং নির্যাতিত হওয়ার জন্য যেখানে তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া তো দূরের কথা বরং রাষ্ট্রের দ্বারা তারা বিভিন্ন জুলুমের শিকার হয়। সামাজিকভাবে বসবাস করতে গেলে দেখা যায় একই ধরনের দৃষ্টান্ত। সমাজে যারা অর্থবান বৃত্তবান তাদের দ্বারাই সমাজ পরিচালিত হয়। তারা যদি কোন অন্যায় থাকেন দেখা যায় সমাজের মানুষ এটাকে সাপোর্ট দেন, বরঞ্চ কেউ প্রতিবাদ করতে আসলে সরে যান। এই দ্বিচারিতার কারণেই সমাজ আজ বৈষম্যের শিকার এবং ন্যায় বিচার থেকে অনেক দূরে।

পরিবারও এর বাহিরে নয়।

দেখা যায় পরিবারের যে ছেলেটা ভালো রোজগার করে তাকে সবাই সম্মান করে,ভালোবাসে তার টাকার জন্য। আর যার রোজগার একটু কম তাকে সবাই দূর দূর করে, অপমান করে, লাঞ্ছনা দেয় এবং বিভিন্ন কটুক্তি মূলক ব্যবহার করে থাকেন। ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ অনুসরণ করা প্রয়োজন। এর ব্যতিক্রম ঘটলে রাষ্ট্র,সমাজ, পরিবার কোনটাই সঠিক পথে পরিচালিত হবে না।

শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামাজিক ন্যায়বিচারের গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০০৭ সালের ২৬ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০ ফেব্রুয়ারিকে বিশ্ব সামাজিক ন্যায়বিচার দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়। দিবসটি প্রথমবার পালিত হয় ২০০৯ সালে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, লিঙ্গ সমতা, অভিবাসন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, অপরাধ ইত্যাদি বিষয় মোকাবিলার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শান্তি, সম্প্রীতি, সমৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ দিবসটি পালন করা হয়।বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বজুড়ে বিশ্বায়নের যে নানা সুযোগ-সুবিধা, সেগুলো পাচ্ছে কেবল সমাজের বিশেষ একশ্রেণির মানুষ। এই সুবিধা গ্রহণে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ। বিশ্বায়নের প্রভাবে নতুন নতুন প্রযুক্তি, নতুন ভাবনার দ্রুত স্থানান্তর, পণ্য ও সেবার দ্রুত বিনিময়, পুঁজির দ্রুত স্থানান্তর প্রভৃতি কারণে কোনো কোনো দেশে বাড়ছে কর্মসংস্থান, অর্থনীতির গতি ও উৎপাদন। অন্যদিকে আবার কোনো কোনো দেশ এই দ্রুত গতির পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না। ফলে সেসব দেশে বাড়ছে বৈষম্য, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য। আমরা জানি, শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামাজিক ন্যায়বিচারের গুরুত্ব অনুধাবন করেই জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আসলে দিবসটি পালনের মাধ্যমে বিশ্বসমাজ এবং নেতাদের বিদ্যমান এ সমস্যাগুলোর দিকে নজর দেওয়ার এবং অবস্থার উন্নয়নের জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার কথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্যও এ বিষয়গুলোর উন্নয়ন অপরিহার্য।সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সবার প্রচেষ্টা দেশের অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ন্যায়বিচার,সমতা এবং ন্যায্যতা সব সমাজেরই মৌলিক মূল্যবোধের ভিত্তিকে গঠন করে। এই মূল্যবোধের

ভিত্তিতে বিশ্বসমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয়,আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সব সরকারকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। তবে বিশ্বনেতাদের সততা ও আন্তরিকতা না থাকলে এই ধারণা শুধু কাগজপত্রেই লিখিত থাকবে।বিশ্বের নেতারা বিভিন্ন সময়ে আয়ের সমবণ্টন এবং ন্যায্যতা, সমতা ও সবার জন্য সমান সুযোগের মাধ্যমে সম্পদে অংশীদারির ব্যাপারে অঙ্গীকার করেছেন।

আমরা মনেকরি সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, নারীনির্যাতন, চোরাচালান মাদক ব্যবসাসহ সকল প্রকার অপরাধমূলক কর্মকান্ড প্রতিরোধে শুধুমাত্র কঠোর আইন প্রয়োগই যথেষ্ঠ নয়। এর পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধ শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক। বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্ত্রাস নির্ভর পেশীবহুল রাজনীতি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে দুর্বল করে দিচ্ছে। ফলে জনগণ গণতন্ত্রের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় অপরাধীদের ক্ষমা করে দেওয়ার ফলে অপরাধীদের দৌরাত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীর উপর সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের উচ্ছৃঙ্খল কর্মীরাই বেশী অগ্রগামী। রাজনৈতিক প্রভাবের দরুন এরা শাস্তির আওতামুক্ত থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। রাজনীতিতে এই সন্ত্রাসীদের ব্যবহার ও চাঁদাবাজ টেন্ডারবাজদের প্রশ্রয়দানের ফলে সমাজ থেকে অপরাধ দূর করা দূরহ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া এর ফলে রাজনীতিতে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিরা আগ্রহ হারাচ্ছে এবং জাতি সময়োপযোগী নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সন্ত্রাসীদের বিদ্যমান সামাজিক প্রভাব যুব সমাজকে সন্ত্রাস-প্রবণ করে তুলছে। এমতাবস্থায় সন্ত্রাস নির্ভর রাজনীতি বন্ধ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যদিও সন্ত্রাস রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে তথাপি সাধারণ জনগণ এই ধরনের রাজনীতি চর্চার বিরোধী। জনগণের এই মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে দেশপ্রেম ও জনকল্যাণমুখি রাজনীতি জনপ্রিয় করা সম্ভব। এর জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়া জরুরী। এর পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার স¤প্রসারণ ও সন্ত্রাস বিরোধী প্রচারণা আবশ্যক। বৈধ গণতান্ত্রিক দলের উপর রাজনৈতিকভাবে আরোপিত সরকার কর্তৃক জুলুম নির্যাতন চরমপন্থাকে উৎসাহিত করছে। তাই জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থা প্রতিরোধে গণতান্ত্রিক ধারায় স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক দল গঠন ও কার্যক্রম পরিচালনা করার পূর্ণাঙ্গ সুযোগ থাকা জরুরী। তাছাড়া ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য আইনের সমান প্রয়োগ ও বিচারব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা জরুরী। রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট বিচারব্যবস্থায় সুশাসণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ন্যায় বিচার

নিশ্চিত করতে বিচার কার্যক্রম দীর্ঘায়িত করা ঠিক নয়। বিচার ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এর জন্য সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন। দলীয় বিবেচনায় বিচারক নিয়োগ দেওয়া বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। সুশাসণ প্রতিষ্ঠায় বিচারব্যবস্থা স্বাধীন হওয়া আবশ্যক। সমাজে নরীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে প্রয়োজনীয় সামাজিক ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। নারীর পতিতাবৃত্তি গ্রহণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ জরুরি। পতিতাবৃত্তি নারী পাচারের প্রধান কারণ। তাই নারী পাচার রোধে পতিতাবৃত্তি বন্ধ হওয়া জরুরী। নিঃসন্দেহে এটি নারীর প্রতি চরম অবমাননা এবং সামাজিক ভাঙ্গনের অন্যতম কারণ। তাই পতিতাবৃত্তি প্রতিরোধে নৈতিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, নারীর কর্মসংস্থনের ব্যবস্থা ও সামাজিক পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদার করা জরুরী। জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অন্যতম প্রধান বাধা দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে দুর্নীতিবাজরা পার পেয়ে যাচ্ছে। ফলে দুর্নীতি প্রতিরোধ দুরুহ হয়ে দাড়িয়েছে। তাই দুর্নীতিবাজদের রাজনৈতিক প্রশ্রয়দান বন্ধ ও দুর্নীতি পরায়ন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। মাদক যুব সমাজের অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। এটি যুবসমাজের স্বক্ষমতাকে কমিয়ে দিচ্ছে এবং পরিবারে ও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। ফলে পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে এবং সমাজে অপরাধমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই মাদকের অবাধ প্রবাহ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। মাদকাসক্তি দূর করণে কঠোর ও সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অনেক দেশের সরকারই স্বীকার করেছে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ন্যায্যতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে, যাতে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধিকার নিশ্চিত করা যায়। এদিকে ন্যায্য বৈশ্বিকীকরণ এবং ন্যায্য বাণিজ্যবিষয়ক আলাপ-আলোচনাও অব্যাহত রয়েছে। এমনকি বিশ্বসমাজ,বিশেষত উন্নত বিশ্ব, অনিয়মিত বা জোরপূর্বক অভিবাসন, অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার, মানবপাচার, জোরপূর্বক শ্রম, মানব শোষণ এবং হতাশার মতো সমস্যাগুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করে যাচ্ছে। এসব উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু এসব চিন্তাধারা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে সন্দেহ ও প্রশ্ন রয়েই যায়।

যাইহোক,ন্যায়ের ব্যাখ্যা করতে গেলে পাওয়া যাবে সুবিচার, মানবতা, মনুষ্যত্ব, দুর্নীতিমুক্ত থাকা। এসব সমাজে প্রতিষ্ঠা করা গেলে প্রতিষ্ঠা করা হবে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ।এবং আয় বৈষম্যহীনতা ধনী-গরিবের মধ্যে ব্যবধান না থাকা, সামাজিক সাম্য ইত্যাদি ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রধান শর্ত। কিন্তু এসব শর্তের কোনোটাই এখন আমাদের চার পাশে বাস্তবায়িত হতে দেখা যায় না।আমরা এমন একটি সময়ে বসবাস করছি যে সময়কে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ যুগ বলা যায়। জীবন যাপনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের আশীর্বাদে আমরা নানা সুবিধা ভোগ করছি। সমাজের এত উন্নতিতে আমাদের জীবনযাপনের মানেরও অনেক পরিবর্তন আসার কথা ছিল। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, উন্নত মানুষদের দ্বারা একটি ন্যায়ভিত্তিক উন্নত সমাজব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমরা তা পারিনি। কিন্তু কেন? এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারকবাহক আধুনিক মানুষেরা একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় কেন বারবার ব্যর্থ হচ্ছে এ কথা কেউ কি কখনো ভেবে দেখেছেন? আসলে সমস্যাটা কোথায়?

সমস্যা আমাদের চিন্তায়, চেতনায়, মননে, বিবেকে, বুদ্ধিতে! আমরা ন্যায়ভিত্তিক সমাজে বাস করার আশা বুকে পোষণ করি, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কখন, কোথায়, কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কোন গুণাবলির কারণে সেই সভ্যতা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল তা জানার চেষ্টা কখনো করি না ন্যায়ভিত্তিক একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অবশ্যই সামাজিকভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। যেখানে ন্যায়বিচার থাকবে না সেখানে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ কল্পনা করা হাস্যকর। বর্তমান সময়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা মুখের কথা নয়। এই সমাজে এখন অন্যায়, অনিয়ম, দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে শক্তভাবে। এখানে ন্যায়বিচার আশা করা অনেকটা আকাশ-কুসুমের মতো।

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নাগরিক সমাজের ভূমিকা থাকতে হবে ব্যাপক। বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক উত্তরণ অসম্পূর্ণ।আমাদের পদচারণা এখনো গণতন্ত্রের ক্রান্তিকালের আবর্তে ঘূর্ণায়মান এবং এটিকে সুসংহত করার সার্বিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ থেকে আমরা আজকের বাস্তবতায় বহুদূরে অবস্থান করছি। তথাপি, একটি তুলনামূলক নবীন গণতন্ত্র হিসেবে এ দেশের গণতান্ত্রিক অবকাঠামোগুলো বিকাশমান পর্যায়ে রয়েছে এবং স্বাভাবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় হোঁচট খেয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। নাগরিক সমাজও তেমনিভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত হতে পারেনি। এ

জন্য প্রয়োজন সুশাসন।সুশাসন কিংবা ন্যায়বিচার ন্যায়ভিত্তিক সমাজের জন্য অন্যতম প্রধান শর্ত।

যার মাধ্যামে বাংলাদেশে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।ন্যায়ভিত্তিক সমাজের বিকাশ, তথা উদার গণতন্ত্র আমাদের সবার প্রত্যাশা। কিন্তু এটি হঠাৎ করেই আসবে না। আমাদের সবাইকেই এই স্বাভাবিক বিকাশের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যাতে প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয়। এ জন্য তাড়াহুড়ো করলে হবে না। তবে শুধু সুশাসন হলে হবে না; এর সাথে নৈতিকতা, মানবতা এবং মনুষ্যত্বও থাকতে হবে। এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজের জন্য এসব বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরি। সমাজের সব নাগরিকের থাকতে হবে ঐক্য। তবে ভিন্নমত থাকতে পারে। এজন্য কারো ওপর আঘাত হানা যাবে না। কিন্তু বর্তমানে আমরা ভিন্নমতের মানুষকে সহ্য করতে পারি না। তাদের ওপর অন্যায় অবিচার সবচেয়ে বেশি হয়। এ ধরনের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। ন্যায়বিচার আর ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায় থাকাটা জরুরি। আর ন্যায়ের স্বার্থে অবশ্যই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নাগরিক সমাজের ভূমিকা থাকতে হবে ব্যাপক। বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক উত্তরণ অসম্পূর্ণ। আমাদের পদচারণা এখনো গণতন্ত্রের ক্রান্তিকালের আবর্তে ঘূর্ণায়মান এবং এটিকে সুসংহত করার সার্বিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ থেকে আমরা আজকের বাস্তবতায় বহুদূরে অবস্থান করছি। বিগত বছরে আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা অক্সফামের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ধনী-দরিদ্র্যের বৈষম্যের এক করুণ চিত্র। সংস্থাটির তথ্য মতে, বর্তমানে ২৬ জন ধনী ব্যক্তির কাছে যে পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, তা পৃথিবীর সব গরিব লোকের অর্ধেকের সমান। অর্থাৎ ২৬ জন মানুষের হাতে ৩৮০ কোটি মানুষের সমান সম্পদ! আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উন্নত মানুষের দ্বারা একটি ন্যায়ভিত্তিক উন্নত সমাজব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমরা তা পারিনি।

কিন্তু কেন পারছি না? এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক-বাহক আধুনিক মানুষর একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় কেন বারবার ব্যর্থ হচ্ছে- একথা কেউ কি কখনো ভেবে

দেখেছেন? আসলে সমস্যাটা কোথায়?সমস্যা হচ্ছে আমাদের চিন্তায়, চেতনায়, মননে, বিবেকে, বুদ্ধিতে! আমরা ন্যায়ভিত্তিক সমাজে বাস করার আশা বুকে পোষণ করি, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কখন, কোথায়, কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কোন গুণাবলির কারণে সেই সভ্যতা সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল তা জানার চেষ্টাও কখনো করি না।

ন্যায়বিচারের একটা স্বাভাবিক পন্থা আছে, যা মানুষ আদিকাল হতে কাজে লাগিয়ে আসছে। এর ভিত্তি আমাদের বিবেক, একে অপরের সঙ্গে সমঝোতার প্রথা। এগুলো বাদ দিয়ে আধিপত্যবাদী শাসকশ্রেণির মাইনে পাওয়া একদল পেশাজীবীর হাতে তৈরি হওয়া আইনের অধীনস্ত হওয়া যৌক্তিক নয়। রাষ্ট্র ও আইনি ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীলতা সংঘাত নিরসনের একটা পরোক্ষ ব্যবস্থা জন্ম দেয়।একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অবশ্যই সামাজিক ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। যেখানে ন্যায়বিচার থাকবে না সেখানে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ কল্পনা করা হাস্যকর বিষয়। সর্বোপরি আমাদের জনগণকে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে।

বিশ্বের নেতারা বিভিন্ন সময়ে আয়ের সমবণ্টন এবং ন্যায্যতা, সমতা ও সবার জন্য সমান সুযোগের মাধ্যমে সম্পদে অংশীদারির ব্যাপারে অঙ্গীকার করেছেন। অনেক দেশের সরকারই স্বীকার করেছে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ন্যায্যতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে, যাতে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধিকার নিশ্চিত করা যায়। এদিকে ন্যায্য বৈশ্বিকীকরণ এবং ন্যায্য বাণিজ্য বিষয়ক আলাপ-আলোচনাও অব্যাহত রয়েছে। এমনকি বিশ্বসমাজ, বিশেষত উন্নত বিশ্ব,অনিয়মিত বা জোরপূর্বক অভিবাসন, অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার, মানবপাচার, জোরপূর্বক শ্রম, মানব শোষণ এবং হতাশার মতো সমস্যা গুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর প্রতি সহিংসতা, আইনের দীর্ঘসূত্রতা এবং আয় ও দারিদ্র্য-এই কয়টি বিষয়ে পর্যালোচনায় দেখা যায়, সামাজিক ন্যায়বিচারের অবস্থা আদতেই সংকটাপন্ন। সরকারের আন্তরিকতার অভাব না থাকলেও বিভিন্ন উদ্যোগের বাস্তবায়নে সমস্যা এবং আইন প্রয়োগের অভাবে সব চেষ্টাই বৃথা যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং কল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দেওয়ার এখনই সময়।

বণ্টন মূলক ন্যায় বিচার :

বন্টন মূলক ন্যায় বিচার একটি সমাজ জুড়ে সম্পদ, বুঝার নায্য ও সম্পদ বন্টনের সাথে সম্পর্কিত।

ন্যায়বিচারকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা সম্ভব। এদের মধ্যে একটি হল বিতরণমূলক ন্যায়বিচার, যেখানে সম্পত্তি ও অন্যান্য পণ্য বিতরণ করা হয়। বিতরণমূলক ন্যায়বিচারের তত্ত্বগুলিতে কী বিতরণ করা হবে, কাকে করা হবে এবং সঠিক বিতরণ কীরকম হবে, সেগুলি আলোচনা করা হয়। অন্যটি হল শাস্তিমূলক বা সংশোধনমূলক বিচার, যেখানে কোন ব্যক্তি মন্দকাজ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। আবার পুনরুদ্ধারমূলক বা ক্ষতিপূরণমূলক ন্যায়বিচারের তত্ত্বে ভুক্তভোগী ও অপরাধীর চাহিদার কথা চিন্তা করে যা ভাল বা উত্তম, সেটিকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়।

সংস্কৃতিভেদে ন্যায়বিচারের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ন্যায়বিচার সম্বন্ধে পশ্চিমী মতবাদগুলির সবই গ্রিক দার্শনিক প্লেটো এবং তার শিষ্য আরিস্টটলের লেখা থেকে উৎসারিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ন্যায়বিচার ঈশ্বর নির্ধারণ করেছেন; একে স্বর্গীয় আদেশ তত্ত্ব নাম দেওয়া হয়। ১৭শ শতকে জন লক ও অন্যান্য তাত্ত্বিকরা প্রাকৃতিক বিধিভিত্তিক তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি দেন। অন্যদিকে সামাজিক চুক্তি ঘরানার চিন্তাবিদেরা বলেন যে সমাজের সবার নিজেদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে ন্যায়বিচার পাওয়া যায়। ১৯শ শতকে জন স্টুয়ার্ট মিল ও অন্যান্য উপযোগবাদী চিন্তাবিদেরা বলেন ন্যায়বিচার তা-ই যার ফলাফল সবচেয়ে শুভ হয়। মানবসমতাবাদীরা যুক্তি দেন যে বিচার কেবলমাত্র মানুষে মানুষে সমতার নিরিখে ধার্য হতে পারে।

ন্যায়বিচারের ধারণা ও প্রকৃতি :

ন্যায়বিচারের ধারণা একটি ভাল উদাহরণ। ন্যায়বিচারের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত ও মতামত রয়েছে।

এর ফলশ্রুতিতে, ন্যায়বিচারের ভুল বা অপর্যাপ্ত ধারণার ফলে মানুষের সম্পর্ক এবং সহাবস্থান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

এটা বিশেষভাবে সত্য, আমি বিশ্বাস করি, কারণ মানবিক সম্পর্ক এবং সহবাসের জন্য ন্যায়বিচার একটি মৌলিক আবশ্যক। তাই এই গবেষণাপত্রে, আমি ন্যায়বিচারের

বিভিন্ন ধারণা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য মানুষের অনুসন্ধান এবং মানুষের সম্ভাবনার পূর্ণ উপলব্ধিতে এই জাতীয় ধারণাগুলির প্রভাব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। শেষে আমি যুক্তি দিচ্ছি যে ন্যায়বিচার হিসাবে ন্যায়বিচার, ন্যায়বিচারের অন্যান্য ধারণার চেয়ে ভাল, যে কোনও সময় এবং যে কোনও দিন মানুষের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বৈশ্বিক সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য মানুষের অনুসন্ধানের উত্তর দেয়।

ন্যায়বিচার সম্পর্কিত কুরআনের আটটি আয়াত :

ন্যায়বিচার হচ্ছে এমন একটি মৌলিক পরিভাষা যা পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে নানা ধরনের উদাহরণ, অলঙ্কার ও সত্য ঘটনার আকারে খুলে খুলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে বারবার ন্যায়বিচারের ওপর অটল ও অবিচল থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

ন্যায় ও ন্যায়বিচারের গুরুত্ব উপলব্ধি করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বর্ণিত এ সংক্রান্ত আয়াতগুলো বোঝার চেষ্টা করা। আজকের এ আলোচনায় আমরা পবিত্র কুরআনের এরকম ৮টি আয়াত তুলে ধরব যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ন্যায় ও ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে:

১- আল্লাহ তায়ালার সকল কাজ ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

"شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ"؛ [قرآن :آل عمران، ١٨]

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, ফেরেশতাগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণও (এই একই বিষয়ে) সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, [আল্লাহর সকল কাজ] ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই।" [আলে-ইমরান, ১৮]

২- আল্লাহ তায়ালা বিন্দু পরিমাণ জুলুম বা অন্যায় করেন না।

"إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَ إِنْ تَکُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَ يُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيما"؛ [قرآن: نساء، 40]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার বা অন্যায় করেন না [তাঁর প্রতিটি কাজ ন্যায়ভিত্তিক] এবং যদি কেউ [ওই অণু পরিমাণ] সৎ কাজ করে তাহলে তিনি তা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন।" [নিসা, ৪০]

৩- মানুষের মাঝে ন্যায়ভিত্তিক বিচার করুন।

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَميعاً بَصيرا"؛ [قرآن :نساء، 58]

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন, তা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [নিসা, ৫৮]

৪- অপরের সঙ্গে শত্রুতার কারণে অন্যায় করো না।

"يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ"؛ [قرآن :مائده، 8]

"হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বুর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।" [মায়েদা, ৮]

৫- মহান আল্লাহ এমনকি জালিমদের প্রতিও জুলুম করেন না।

"وَ لَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما فِي الْأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ"؛ [قرآن :يونس 54]

"আর যমীনে যা রয়েছে, তা যদি প্রত্যেক যুলুমকারী ব্যক্তির হয়ে যায়, তবে সে মুক্তির বিনিময়ে সেসব দিয়ে দেবে এবং অনুতাপ গোপন করবে যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। আর তাদের মীমাংসা ন্যায়ভিত্তিক করা হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।" [ইউনূস, ৫৪]

৬- মানুষের অধিকার প্রদান করার ক্ষেত্রে অন্যায় করো না।

"وَ يا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَ الْميزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدينَ] "قرآن، هود ۸۵[

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপো ও ওজন করো, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।" [হুদ, ৮৫]

৭- মানুষকে ন্যায় ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

"،لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ"؛]قرآن :حديد ۲۵]

"নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদন্ড নাযিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।" [হাদিদ, ২৫]

৮- মহান আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।

وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ"؛]قرآن :حجرات، ۹["

"তাদের মধ্যে ইনসাফের সঙ্গে ফয়সালা কর আর সুবিচার কর; আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন।" [হুজুরাত, ৯]

বিচারক প্রসঙ্গে হাদিস :

১৩২২। আবদুল্লাহ ইবনু মাওহাব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, উসমান (রাঃ) ইবনু উমার (রাঃ)-কে বলেন, যাও! লোকদের মাঝে বিচার-ফায়সালা কর। তিনি বললেন, হে মু'মিনদের নেতা! আমাকে কি মাফ করবেন? তিনি বললেন, এ পদটি তুমি কেন অপছন্দ করছ, অথচ তোমার পিতা বিচার-ফায়সালা করতেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ কোন ব্যক্তি কাযী (বিচারক) নিযুক্ত হয়ে ইনসাফের উপর বিচার-ফায়সালা করলেও সে বরাবর আমল নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে (না তার কোন গুনাহ আছে আর না তার কোন সাওয়াব আছে)। এরপর আমি আর কি আশা করতে পারি?

যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৩৭৪৩)। তা'লীকুর রাগীব (২/১৩২) তা'লীক আলা আহাদীস মুখতারাহ (৩৪৮, ৩৪৯)

হাদীসের সাথে একটি ঘটনা আছে। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীসটি গারীব। আমার মতে এ হাদীসের সনদ পরস্পর সংযুক্ত নয়। কেননা যে আবদুল মালিক হতে মুতামির রিওয়াত করেছেন তিনি হলেন আবদুল মালিক ইবনু আবূ জামীলা।

১৩২২/২। বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কাজীগণ তিন প্রকারের হয়ে থাকে। দুই প্রকারের কাযী (বিচারক) হচ্ছে জাহান্নামী এবং এক প্রকার কাযী হচ্ছে জান্নাতী। জেনেশুনে যে লোক (বিচারক) অন্যায় রায় প্রদান করে সে হচ্ছে জাহান্নামী। সত্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করেই যে লোক (বিচারক) মানুষের অধিকারসমূহ নস্যাৎ করে সে লোকও জাহান্নামী। আর যে লোক ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়সালা প্রদান করে (বিচারক) সে জান্নাতের অধিবাসী।

সহীহ, ইরওয়া (২৬১৪), মিশকাত (৩৭৩৫)

১৩২৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কাযীর পদ চেয়ে নেয় তার দায়দায়িত্ব তার উপরই চাপিয়ে দেয়া হয়। আর যাকে এই পদ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় আল্লাহ তা'আলা তার নিকট একজন ফিরিশতা পাঠিয়ে দেন যিনি তাকে ইনসাফের পথে থাকতে সহযোগীতা করেন।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৩০৯)

১৩২৪। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি বিচারকের পদ চায় এবং অন্যদের দিয়ে তার জন্য সুপারিশ করায়, তাকে তার নিজের উপর ছেড়ে দেয়া হয় (এবং আল্লাহ তা'আলার সাহায্য হতে বঞ্চিত করা হয়)। আর যাকে জোর করে এ পদে বসানো হয়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একজন ফিরিশতা পাঠিয়ে দেন, যিনি তাকে ইনসাফের পথে অনুপ্রাণিত করেন।

যঈফ, প্রাগুক্ত

আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। পূর্ববর্তী ইসরাঈলের হাদীসের তুলনায় এটি অনেক বেশী সহীহ।

১৩২৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করল অথবা জনগণের বিচারক হিসেবে যে লোককে নিয়োগ করা হল তাকে যেন ছুরি ছাড়াই যবেহ করা হল।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৩০৮)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদসূত্রে হাসান গারীব বলেছেন। এ হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে আরো একটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অসৎ বিচারকের শাস্তি :

ইসলাম সর্বদা ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিয়েছে। স্বার্থ, নৈকট্য যেন বিচারকে প্রভাবিত না করে এটা বিশেষভাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য বিচারকার্যে অসততা , অন্যায়, দুর্নীতি হারাম ও মারাত্মক অপরাধ। বিচারক সেজে বিচারকার্যে দুর্নীতি করাও আরো জঘন্য অপরাধ। বিচারকের জন্য ইনসাফ ও সততা অবলম্বন করা অপরিহার্য।
এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে শাসক আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, আল্লাহ তার নামাজ কবুল করেন না।' (মুসতাদরাকে হাকিম)

তিনি আরো বলেন, 'এক শ্রেণির বিচারক জান্নাতে যাবে, আর দুই শ্রেণির বিচারক জাহান্নামে যাবে। যে বিচারক জান্নাতে যাবে, সে হলো এমন বিচারক, যে সত্য ও ন্যায়কে যথার্থ উপলব্ধি করে এবং তদনুযায়ী বিচার করে। পক্ষান্তরে যে বিচারক সত্য যথার্থ উপলব্ধি করেও ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় রায় দেয়, সে জাহান্নামি। তদ্রুপ যে বিচারক সত্যকে যথার্থ উপলব্ধি না করে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী রায় দেয়, সে-ও জাহান্নামি।' (আবু দাউদ)

কোরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলা মানুষকে ন্যায়ের পথে পরিচালিত হওয়ার আদেশ করেছেন। নবীজি (সা.), যিনি ছিলেন ন্যায়-নীতির প্রতীক, তাঁকে উদ্দেশ করে আল্লাহ বলেছেন, 'আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আল্লাহর দেখানো পথে আপনি বিচার করতে পারেন।

আর আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হবেন না।'
(সুরা : নিসা, আয়াত : ১০৫)

অন্যদিকে সব মানুষকে সতর্ক করে আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে ফিরিয়ে দিতে। আর তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকাজ পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচারকাজ সম্পাদনা করবে।'

(সুরা : নিসা, আয়াত : ৫৮)

নবীজির বর্ণনায় তিন শ্রেণির বিচারক এবং তাদের পরিণতি

নবীজি (সা.) বিচারকদের তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন এবং তাদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। বুরাইদা (রা.) স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘বিচারক তিন শ্রেণির।

তন্মধ্যে দুই শ্রেণি জাহান্নামি আর এক শ্রেণি জান্নাতি। যে বিচারক মানুষের অধিকার বুঝে সে অনুযায়ী বিচারকাজ করবে সে জান্নাতি। আর যে বিচারক মানুষের অধিকার বুঝেছে, কিন্তু তা অনুযায়ী বিচারকাজ করেনি এবং যে বিচারক মানুষের অধিকার না বুঝে মূর্খতাবশত বিচারকাজ করবে, তারা উভয়ে জাহান্নামি
(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস : ২১৫৭১)

সে জন্য বিচারকদের উচিত সঠিকভাবে মামলা স্টাডি করা এবং প্রকৃত দোষীকে শাস্তির মুখোমুখি করা। কারো কোনো চাপে কিংবা উৈকাচের লোভে এই মহান পেশাকে কলুষিত করে নিজেকে জাহান্নামের উপযুক্ত করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।
ন্যায়-বিচ্যুত বিচারকের পরামর্শক শয়তান

ন্যায়পরায়ণ বিচারকের সাহায্যকারী স্বয়ং আল্লাহ। পক্ষান্তরে ন্যায়-বিচ্যুত জালিম বিচারকের বন্ধু অভিশপ্ত ইবলিস। আর ইবলিস যার সঙ্গী হবে তার ধ্বংস অনস্বীকার্য। নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত বিচারকের সঙ্গে থাকেন, যতক্ষণ সে জুলুম না করে ন্যায়ের ওপর অটল থাকে। কিন্তু যখনই সে অন্যায় করে, তখন আল্লাহ তার থেকে মুক্ত হয়ে যান। তখন শয়তান তাকে ধরে ফেলে। তার সঙ্গী ও পরামর্শক হয়ে যায়।’

(তিরমিজি, হাদিস : ১৩৩০)

উৎকোচ গ্রহণকারী বিচারকের প্রতি নবীজির অভিসম্পাত

বিচারকাজে অন্যায়-অন্যায্য রায় প্রদানের জন্য যারা উৎকোচ গ্রহণ করে, ঘুষ নেয়, তাদের প্রতি নবীজি অভিসম্পাত করেছেন। আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, নবীজি (সা.) বলেছেন, 'বিচারকাজ ঘুষদাতা ও গ্রহীতার প্রতি নবীজি অভিসম্পাত করেছেন।'

(মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৯০২৩)

অন্য হাদিসে এসেছে, নবীজি (সা.) বলেছেন, 'ঘুষদাতা গ্রহীতা উভয়ে জাহান্নামি।'

(মুসনাদুল বাজ্জার, হাদিস : ১০৩৭)

মহান আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।(খতিব বায়তুল আজম জামে মসজিদ)

ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী আইন বিচার :

অপরাধ আইনের কিছু বিষয়কে আংশিকভাবে উপস্থাপন করে এগুলির ভিত্তিতে ইসলামী আইন, বিচার ও বিচারব্যবস্থাকে বর্বর, মধ্যযুগীয় এবং পুরোহিততান্ত্রিক বলে অপপ্রচার করা হয়। আবার অনেক আবেগী মুসলিম ইসলামী অপরাধ আইনের কয়েকটি দিককেই "ইসলামী আইন", এগুলির অনুপস্থিতিকে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং এগুলি প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামী রাষ্ট্রের একামত্র পরিচয় বলে মনে করেন।

যে কোনো রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব (১) নাগরিকদের বৈষম্যহীন অধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা (২) বহির্শক্রর আগ্রাসন থেকে রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ইসলামেও এ দুটি বিষয়কে রাষ্ট্রের মূল দায়িত্বগুলির অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলামে "জিহাদ"-এর বিধান প্রদান করা হয়েছে। আর প্রথম দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলামে আইন ও বিচারব্যবস্থা বিষয়ক নীতিমালা প্রদান করা হয়েছে।

ইসলামী আইন ও আইন প্রয়োগের দুটি দিক রয়েছে: (১) আইন ও (২) বিচারব্যবস্থা। ইসলামী আইন বিষয়ে অনেক অপপ্রচার থাকলেও যে কোনো মতের ও ধর্মের গবেষক ইসলামী বিচারব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতের বিষয়ে নিশ্চিত হবেন। বিচারকের নিরপেক্ষতা, বিচারের সচ্ছতা, সাক্ষ্য গ্রহণ, সাক্ষ্য-প্রমাণের সঠিকত্ব প্রমাণ, অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ, সন্দেহের সুযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকললের জন্য ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম অত্যন্ত কার্যকর, মানবিক ও সচ্ছ বিচারব্যবস্থা প্রদান করেছে। আধুনিক বিশ্বের প্রায় সকল দেশের বিচারব্যবস্থার অনেক বিষয় ইসলামী বিচারব্যবস্থা থেকে গৃহীত।

ইসলামের পারিবারিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক, সাম্পদিক, অধিকার বিষয়ক ও অন্যান্য সকল দেওয়ানী (civil) আইনের বিষয়েও অবিকল একই কথা বলতে হবে। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি দেওয়ানী, সামাজিক, পারিবারিক ও অন্যান্য বিষয়ে ইসলামী আইন গৃহীত, প্রচলিত বা স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের দেশের ও অন্যান্য মুসলিম দেশের বিচারব্যবস্থা ও দেওয়ানী আইন সবই মূলত ইসলামী।

এগুলির পাশাপাশি ইসলামে "অপরাধ আইন" রয়েছে। বিশ্বের সকল দেশের অপরাধ-আইনের উদ্দেশ্য অপরাধীর শাস্তি ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণ। ইসলামের অপরাধ আইনেরও একই উদ্দেশ্য। পার্থক্য শাস্তির প্রকৃতিতে। ইসলামে অল্প কয়েকটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট সকল অপরাধের ক্ষেত্রে যুগ, জাতি ও সমাজের প্রেক্ষাপটে শাসক, পার্লামেন্ট, সরকার বা বিচারক শাস্তির প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারেন।

ইসলামে নির্ধারিত শাস্তিগুলি নিম্নরূপ: (১) ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। (২) ইচ্ছাকৃত অঙ্গহানির শাস্তি অনুরূপ অঙ্গহানি। (৩) চুরির শাস্তি কব্জি থেকে হাত কেটে দেওয়া। (৪) ব্যভিচারের শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত ও বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি মৃত্যুদন্ড। (৫) কারো বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ করে তা ৪ জন সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে না পারলে অভিযোগকারী ও সাক্ষীগণের শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত। (৫) জেনে বুঝে ইসলাম গ্রহণ করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। (৬) মদপানের শাস্তি ৪০ বা ৮০ বেত্রাঘাত।

এ সকল শাস্তি কেবলমাত্র মুসলিম নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য। বিশেষত ব্যভিচার ও মদপানের উপর্যুক্ত শাস্তি একান্তভাবেই মুসলিম অপরাধীর জন্য প্রযোজ্য। কোনো মুসলিম নাগরিক এ সকল অপরাধে লিপ্ত হয়েছেন বলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলে তিনি এ শাস্তি ভোগ করবেন। অমুসলিমদের জন্য এ সকল শাস্তি প্রযোজ্য নয়। তারা তাদের ধর্মীয় আইনে বা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনে বিচার ও শাস্তি ভোগ করবেন।
হত্যা, অঙ্গহানি ও চুরি এ তিনটি অপরাধের বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। তবে শাস্তির প্রকৃতি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইসলামী শাস্তিকে পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ কঠোর বা মধ্যযুগীয় বলে দাবি করেন। ব্যভিচার, মদপান ও ধর্মত্যাগকে তারা অপরাধ বলে গণ্য করতে নারাজ। এগুলির শাস্তিপ্রদানকেও তারা মধ্যযুগীয় ও ধর্মান্ধতা বলে আখ্যায়িত করেন। প্রকৃত সত্য হলো, "অপরাধ নিয়ন্ত্রণ"-এর লক্ষ্য অর্জনে ইসলামী বিচারব্যবস্থা ও ইসলামী দেওয়ানী আইন-এর পাশাপাশি ইসলামী অপরাধ-আইনের সঠিক বাস্তবায়নই সবচেয়ে বড় সহায়ক। এ সকল আইন কঠোর হলেও তা অমানবিক বা বর্বর নয়; বরং মানবতার সংরক্ষণে ও বর্বরতা নিয়ন্ত্রণে তা সর্বোচ্চ সহায়ক। এখানে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

(১) ইসলামের এ সকল শাস্তি যেমন কঠোর করা হয়েছে প্রয়োগ তার চেয়ে অনেক কঠিন ও প্রায় অসম্ভব করা হয়েছে, যেন কোনোভাবেই নিরপরাধ বা কম অপরাধী শাস্তি না পায়। অপরাধ শতভাগ প্রমাণিত হওয়া, অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কোনোরূপ ওযর না থাকা এবং অপরাধের শাস্তিযোগ্যতার পর্যায় নিশ্চিত হওয়া এ সকল নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগের পূর্বশর্ত। সামান্য সন্দেহ হলে বিচারক অপেক্ষাকৃত হালকা শাস্তি প্রদান করবেন। হত্যা, অঙ্গহানী ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিহতের উত্তরাধিকারিগণ বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে ক্ষতিপূরণ নিয়ে বা কিছু না নিয়ে ক্ষমা করতে পারেন। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী অথবা ব্যক্তির স্বেচ্ছায় স্বীকৃতির ভিত্তিতেই বিচার শুরু হতে পারে। সাক্ষীগণের সাক্ষ্য ত্রুটিপূর্ণ হলে সাক্ষীগণ ও অভিযোগকারী প্রত্যেকে ৮০ বেত্রাঘাত শাস্তি ভোগ করবেন। উপরন্তু সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বিচারিক সকল ক্ষেত্রে তাদেরকে স্থায়ীভাবে "সাক্ষ্যদানের অযোগ্য" বলে ঘোষণা দেওয়া হবে। স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি প্রদানকারী ব্যক্তি পরে অস্বীকৃতি জানালে তার অস্বীকৃতিই কার্যকর হবে।
(২) বস্তুত, এ সকল শাস্তির উদ্দেশ্য অপরাধ নিয়ন্ত্রণ। সহজ শাস্তির মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ হয় না। এছাড়া শাস্তি সহজ হলে নিরপরাধের শাস্তি পাওয়ার সুযোগ বেশি হয়। শাস্তি হালকা হওয়ার কারণে বিচারক সহজেই শাস্তি দেন এবং শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিরপরাধ হলেও তা মেনে

নেন। আর কঠিন শাস্তির ক্ষেত্রে বিচারক, সমাজ, রাষ্ট্র, বিচারকৃত ব্যক্তি সকলেই অত্যন্ত সজাগ থাকেন, যেন নিরপরাধ শাস্তি না পায় বা অল্প অপরাধে কঠিন শাস্তি না হয়।

(৩) অপরাধ বিষয়ক গবেষণা প্রমাণ করে যে, অল্পসংখ্যক অপরাধীর শাস্তি দিয়ে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা ইসলামী আইনের মাধ্যমেই সম্ভব। অতীতের মুসলিম সমাজগুলিতে খুব কম মানুষেরই হাত কাটা হয়েছে বা মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শাস্তির ভয়াবহতার কারণে অপরাধ কম সংঘটিত হয়েছে। বর্তমানেও সৌদি আরব, ইরান, পাকিস্তান, উপসাগরীয় ও মধ্যপ্রাচীয় কয়েকটি দেশে এ সকল শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে খুব কম সময়ে এ সকল শাস্তি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু শাস্তির বিদ্যমানতার কারণে অপরাধী ভয় পায়। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য ব্যবস্থায় শাস্তির মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ হয় না, বরং অপরাধীর মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

(৪) পাশ্চাত্যে অধিকাংশ দেশে 'ড্রাগস' বা 'মাদকদ্রব্য' গ্রহণ ও বিপনন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও মদপান অপরাধ নয়। অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতির দিক থেকে মদ ও ড্রাগস উভয়ই সমান, বরং মদের ক্ষতি অধিক। প্রায় আড়াই শতাব্দী ধরে ইউরোপ ও আমেরিকায় মদ নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনেক আন্দোলন হয়েছে। নারীরা এ সকল আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। এ সকল আন্দোলনের ভিত্তিতে গত শতাব্দীতে ইউরোপের অনেক দেশে মদ নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। আমেরিকায় **১৯২০** সালে মদ নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু মদব্যবসায়ীদের চাপে **১৯৩৩** সালে তা আবার বৈধ করা হয়।

মাদকাসক্তি/মদ-নির্ভরতা আধুনিক সভ্যতার ভয়ঙ্করতম ব্যধিগুলির অন্যতম। বিশ্বে অগণিত সফল ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবি, টেকনিশিয়ান, শ্রমিক ও অনুরূপ সফল মানুষের জীবন ও পরিবার ধ্বংস হয়েছে মদের কারণে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুসারে বিশ্বের ৭৬ মিলিয়ন মানুষ মদ পানের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন রকমের কঠিন রোগে ভুগছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার শতকরা **১৫** ভাগ এবং রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মদপান জনিত মারাত্মক রোগব্যধিতে ভুগছেন। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ মদপান ও মদ-নির্ভরতাকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা বলে চিহ্নিত করছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুসারে বর্তমান বিশ্বের সকল রোগব্যাধির শতকরা ৩.৫ ভাগ মদপান জনিত। মদপান ও মাতলামির কারণে প্রতি বৎসর শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই **১৮৫** বিলিয়ন ডলার নষ্ট হয়। ইসলাম ঈমান ও আল্লাহর ভয়ের পাশাপাশি আইনের মাধ্যমে এ ভয়ঙ্কর ব্যাধিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ

করেছে। এ আইনে একমাত্র মদব্যবসায়ী ছাড়া কারো কোনো ক্ষতি হয় না, শাস্তিপ্রাপ্তের সংখ্যা বাড়ে না কিন্তু এ আইনের মাধ্যমে এ ভয়ঙ্কর ব্যাধি নির্মূল হয় বা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৫) ইহূদীধর্ম, খৃস্টধর্ম ও অন্য সকল ধর্মেই ব্যভিচারকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, বিশেষত বাইবেলে ব্যভিচার ও সকল প্রকার অবৈধ যৌনতাকে মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় ধর্ষণকে অপরাধ বলা হলেও ব্যভিচারকে বৈধ করা হয়েছে এবং বিষয়টিকে মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু 'ড্রাগস' বিক্রয় ও গ্রহণকে এভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা হিসেবে গণ্য করা হয় না। অথচ ব্যক্তি, সমাজ ও মানবসভ্যতার জন্য ড্রাগসের চেয়ে ব্যভিচার অনেক বেশি ক্ষতিকর। আধুনিক সভ্যতা প্রমাণ করেছে যে, ব্যভিচারের মাধ্যমে পরিবার নষ্ট হয়, সন্তানগণ পারিবারিক স্নেহ ও প্রতিপালন থেকে বঞ্চিত হয়, তাদের মধ্যে মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশ ব্যহত হয় এবং হিংস্রতা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত ড্রাগসের কারণে ব্যক্তির জীবন নষ্ট হয় আর ব্যভিচারের মাধ্যমে মানবসভ্যতা বিনষ্ট হয়। এজন্য ইসলামে মদপান, মাদকদ্রব্য গ্রহণ, বিপনন ও ব্যভিচারকে কাছাকাছি পর্যায়ের কঠিন অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

(৬) ইহূদী-খৃস্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে বিধর্মী ও ধর্মত্যাগীর মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে। যদি কোনো গ্রাম বা নগরীর অধিবাসীরা ধর্মত্যাগ করে তাহলে তথাকার সকল মানুষকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে এবং সকল পশুও হত্যা করতে হবে। তথাকার সকল সম্পদ ও দ্রব্যাদি পুড়িয়ে ফেলতে হবে। অগ্নিদগ্ধ জনপদটি চিরিকালীন ঢিবি হয়ে থাকবে। কখনোই আর তা পুনর্বার নির্মিত হবে না। উপরন্তু ধর্মের নির্দেশ সামান্য লঙ্ঘন করলেও মৃত্যুদন্ডের বিধান দেওয়া হয়েছে। যেমন, শনিবারে খড়ি কুড়ালে বা কর্ম করলে তাকে জনসমক্ষে পাথর মেরে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার বিধান রয়েছে।[2] ইসলাম অন্য ধর্মের অনুসারীদের ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপপ্রয়োগ বা প্রলোভন নিষিদ্ধ করেছে। পাশাপাশি মুসলিমের জন্য অন্যধর্ম গ্রহণ মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের স্থিতি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র রোধ করতেই এ বিধান দেওয়া হয়েছে। যারা বাইবেলকে ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করেন তাদের মুখে এবং আধুনিক যুগে যারা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার নামে অমানবিক আইন তৈরি করছেন বা সমর্থন করছেন তাদের মুখে ইসলামের এ আইনকে অমানবিক বলা মোটেও মানায় না।

(৭) মুমিন বিশ্বাস করেন যে, কিভাবে মানুষের অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং কোন্ অপরাধে কোন্ শাস্তি সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য তা মহান স্রষ্টা আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। আইনের বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ প্রশস্ততা দিয়েছেন এবং যুগ ও সমাজের আলোকে আইন তৈরির সুযোগ দিয়েছেন। শুধু যে সকল বিষয়ে প্রয়োজন সেক্ষেত্রেই তিনি শাস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

মুমিনের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ মহান আল্লাহর বিধানের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করা। সালাত, সিয়াম, বিবাহ ইত্যাদি সকল বিষয়ের ন্যায় বিচারব্যবস্থা, দেওয়ানী আইন ও অপরাধ আইনের ক্ষেত্রেও আল্লাহর নির্দেশ মান্য করা মুমিনের ঈমান ও ইসলামের দাবী। যদি কোনো মানুষ মনে করেন যে, সালাতের ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশ সর্বজনীন, সর্বকালীন এবং সর্বোত্তম, কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশ সর্বোত্তম নয় বা সর্বজনীন নয় তাহলে তিনি মুমিন বলে নিজেকে দাবি করতে পারেন না।

(৮) অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী যে কোনো দেশের জন্য ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন এ আগ্রহ পূরণের অন্যতম সহায়ক। বিশেষত মুসলিম দেশগুলির আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা অবস্থার উন্নয়নে ইসলামী অপরাধ-আইন বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। সকল মুসলিম দেশের সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব আল্লাহর প্রতি ঈমান, ধর্মীয় প্রেরণা, দেশপ্রেম ও নাগরিকদের স্বার্থে ইসলামী আইনের সঠিক বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া।

(৯) আল্লাহর পথে আহবানকারী যেমন সালাত, সিয়াম, যিকর ইত্যাদি কুরআন নির্দেশিত ইবাদত বাস্তবায়নের আহবান করবেন, তেমনি কুরআন নির্দেশিত আইন, বিচার ইত্যাদির বাস্তবায়নের আহবান করবেন। সালাত পালনে আল্লাহর নির্দেশের অবহেলা যেমন তাকে ব্যথিত করে, বিচার পালনে আল্লাহর নির্দেশের অবহেলাও তাকে তেমনি ব্যথিত করে। এ তার ঈমানের দাবি। কুরআন-সুন্নাহর কোনো নির্দেশনার প্রতি অবহেলা দেখে ব্যথিত না হলে ঈমান থাকে না।

(১০) সালাত, সিয়াম ইত্যাদির দাওয়াতের ন্যায় আইন ও বিচার বিষয়ক দাওয়াতও বিনম্রতা, উত্তম আচরণ ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে হতে হবে। কোনো অবস্থাতেই সহিংসতা বা বলপ্রয়োগ মুমিনের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কোনো নির্দেশ অমান্য হতে দেখলে কোনোরূপ ব্যাথা ও আপত্তি হৃদয়ে অনুভব না করা ঈমান হারাণোর লক্ষণ। সাধ্য থাকা সত্ত্বেও দাওয়াত না দিয়ে নীরব থাকলে পাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্তত কেউই

যদি কথা না বলেন তবে সকলেরই পাপী হওয়ার সম্ভাবনা। বিনম্রতা ও শোভন আচরণের সাথে দাওয়াতের দায়িত্ব আদায় করলে সুনিশ্চিত সাওয়াবের আশা করা যায়। আর অশোভন আচরণ, উগ্রতা, বলপ্রয়োগ বা সহিংসতার আশ্রয় গ্রহণ করলে সুনিশ্চিত কঠিন পাপ অর্জন ছাড়া কোনোই লাভ হবে না। এতে নিজের মনের ক্ষোভ বা প্রতিশোধস্পৃহা পূরণ হতে পারে এবং মুমিনকে জাহান্নমে নেওয়ার ও মুসলিম সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শয়তান ও তার অনুসারীদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি মুমিনের বা মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ হয় না। আমরা দেখছি যে, আমাদের দেশে বিচারব্যবস্থা, দেওয়ানী আইন ও কোনো কোনো অপরাধ-আইন ইসলাম নির্দেশিত বা ইসলাম সম্মত। আর কিছু ইসলামী আইন বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

ন্যায়পরায়নতা ও সুশাসন :

আল্লাহ তাআলার একটি নাম হলো 'আদল' অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ। আদালত অর্থ ন্যায়ের স্থান। মানবজীবনে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব অপরিসীম।

কোরআন মজিদে আল্লাহর পরিচয় দেওয়া হয়েছে, 'তিনি বিচার দিবসের মালিক।' (সুরা-১ ফাতিহা, আয়াত: ৩) যা আমরা প্রতিদিন বহুবার পাঠ করে থাকি। আল্লাহর একটি নাম 'হাকিম' বা ন্যায়বিচারক। তিনি বলেন, 'আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন।' (সুরা-৯৫ ত্বিন, আয়াত: ৮) 'তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক।' (সুরা-১২ ইউসুফ, আয়াত: ৮০)

সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও নিরাপত্তা বিধানে ন্যায়বিচার ও সুশাসন অপরিহার্য। মানবিকতা, ন্যায়নীতি ও সুবিচার ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান এবং 'আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনবিধান।' (সুরা-৩ আলে ইমরান, আয়াত: ১৯)
ইনসাফ অর্থ সমান দুই ভাগ করা, বেশি বা কম না করা। এ জন্য বিচারককে বলা হয় 'মুনসিফ'। সুবিচার প্রাপ্তি সব নাগরিকের অধিকার ও ন্যায়বিচার আল্লাহর হুকুম ফরজ ইবাদত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে

তোমরা অবিচল থাকবে, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, ইহা তাকওয়ার নিকটতর।' (সুরা-৫ মায়িদা, আয়াত: ৮)

ন্যায়ের বিধান সর্বকালের ও সব সমাজের জন্য কাম্য। সব আসমানি কিতাবে এই নির্দেশ রয়েছে, 'নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম; তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো; নবীগণ, যারা আল্লাহর অনুগত ছিল, তারা ইহুদিদিগকে তদনুসারে বিধান দিত, আরও বিধান দিত রব্বানিগণ ও বিদ্বানগণ, কারণ, তাদের আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল তার সাক্ষী। সুতরাং তোমরা নির্বোধ লোকদের ভয় কোরো না, আর শুধু আমাকেই ভয় করো। আমার আয়াতের বিনিময়ে সামান্য সম্পদ ক্রয় কোরো না। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তবে তারাই "কাফির"। আমি তাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়ে ছিলাম যে প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম। অতঃপর কেহ তা ক্ষমা করলে উহাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তবে তারাই "জালিম"। ইঞ্জিল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ উহাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তবে তারাই "ফাসিক"।' (সুরা-৫ মায়িদা, আয়াত: ৪৪-৪৭)
ইসলামি বিধানের উদ্দেশ্য হলো মানবকল্যাণ তথা জীবন সুরক্ষা, সম্পদ সুরক্ষা, জ্ঞান সুরক্ষা, বংশপরম্পরার পবিত্রতা সুরক্ষা এবং এসবের মাধ্যমে ধর্ম সুরক্ষা। হাশরের দিন যাঁরা আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন 'ন্যায়পরায়ণ শাসক'।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, নবীজি (সা.) বলেছেন, 'সাত ধরনের ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর (আরশের) ছায়ায় স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না। ন্যায়বান শাসক, আল্লাহর ইবাদতে আনন্দ পাওয়া যুবক, ওই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে যুক্ত থেকে বের হওয়ার পর ফিরে আসা পর্যন্ত, এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্য একে অন্যকে মহব্বত করে, এরই ওপর একত্র হয় এবং এরই ওপর পৃথক হয়, এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী রমণী (অন্যায়) আহ্বান করলেও

সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, এমন লোক যারা এমন গোপনে দান করে, তার ডান হাত কী দান করল তা তার বাঁ হাত জানতে পারে না, আর ওই ব্যক্তি যে নির্জন–নিভৃতে আল্লাহকে স্মরণ করে তার দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়।' (মুত্তাফাকুন আলাইহি-বুখারি: ৬৬০, মুসলিম: ১০৩১, তিরমিজি: ২৩৯১) (শায়েখ মুহাম্মদ উসমান গনী)

ইসলাম ন্যায়বিচার সম্পর্কে যেমন কথা বলে :

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত পন্থায় ইনসাফভিত্তিক বিচার-ফায়সালাকেই ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার বলা হয়। যেখানে কোনো স্বজনপ্রীতি থাকবে না। ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত কোনো স্বার্থ থাকবে না। ধনী-গরিব, ধর্ম-বর্ণ ভেদাভেদ থাকবে না। কারো ওপর জুলুম করা হবে না, বরং অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি পাবে, এক্ষেত্রে কম-বেশি করা হবে না এবং যার যার হক যথাযথ পাবে। ন্যায়বিচার পাওয়া প্রতিটি মানুষের অধিকার। সমাজে যত অন্যায়-অনাচার এর প্রধান কারণ ন্যায়বিচারহীনতা।

ইসলাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে তোমরা দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, এমনকি সেই সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও। যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে, সে ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ্ উভয়েরই সর্বোত্তম অভিভাবক। অতএব তোমরা যাতে ন্যায়বিচার করতে সক্ষম হও, সেজন্য তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না আর তোমরা যদি পেঁচানো কথা বলো অথবা সত্য এড়িয়ে যাও, তবে মনে রেখো, তোমরা যা করো সে বিষয়ে নিশ্চয় আল্লাহ পুরোপুরি অবগত আছেন।' (সুরা নিসা: ১৩৫)
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ করো, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (সুরা মায়োদা: ৮)

আরও বলা হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে কোনো বিচার-ফয়সালা করো, তখন ইনসাফভিত্তিক ফয়সালা করো। আল্লাহ তাআলা তোমাদের সদুপদেশ দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।’ (সুরা নিসা: ৫৮)

ইসলামে ন্যায়বিচারের একমাত্র সূত্র কোরআন ও সুন্নাহ। বর্ণিত হয়েছে, ‘যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না তারাই কাফের।’ (সুরা মায়েদা: ৪৪)

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সুযোগ ইসলামি শরিয়তে নেই। কেননা ন্যায়বিচারের বিশুদ্ধ ও সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত নবীজির জীবনীতেই রয়েছে। তাই মুসলিম উম্মাহর জন্য বিচার-ফায়সালাসহ সবক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহর অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘অতএব, আপনার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক বলে মনে না করে। এরপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।’ (সুরা নিসা: ৬৫)

প্রিয়নবীর (স.) শাসনকাল পুরোটাই ন্যায়বিচারে পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে অনেক হাদিস রয়েছে। একটি হাদিস এখানে তুলে ধরছি। হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, মাখজুম গোত্রের এক নারী চোরের ঘটনা কুরাইশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। এ অবস্থায় তারা বলাবলি করতে লাগল এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে কে আলাপ করতে পারে? তারা বলল, একমাত্র রাসুল (স.)-এর প্রিয়তম ওসামা বিন জায়েদ (রা.)। সবাই মিলে সুপারিশের জন্য ওসামা (রা.)-কে নির্ণয় করলেন।

ওসামা (রা.) নবী (সা.)-এর সঙ্গে কথা বললেন। নবী (স.) বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনকারিণীর সাজা মওকুফের সুপারিশ করছ? অতঃপর নবী (স.) দাঁড়িয়ে খুতবায় বললেন, তোমাদের আগের জাতিকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে যখন তাদের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট অভিজাত লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অন্যদিকে যখন কোনো অসহায় গরিব সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার ওপর দণ্ড জারি করত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মদ (স.)-এর কন্যা ফাতিমাও

চুরি করত; তাহলে আমি তাঁর অবশ্যই (দণ্ডবিধি অনুসারে) হাত কেটে দিতাম। (সহিহ বুখারি: ৩৪৭)

খলিফা হারুনুর-রশিদের ন্যায় বিচারের ঘটনা।

সিরিয়ার একটি শহরের নাম রাকা। সেখান থেকে খলিফা হারুনুর-রশিদের নিকট চিঠি আসলো। চিঠিতে লেখা ছিল: শহরের বিচারক এক মাস যাবত অসুস্থ, বিচার কাজ স্থগিত হয়ে আছে । খলিফা যেন দ্রুত ব্যবস্থা করেন । খলিফা চিঠির জবাব পাঠালেন । আগামী সপ্তাহের মধ্যে নতুন বিচারক আসবেন । এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন বিচারক এসে যোগ দিলেন ।

বিচার কাজ শুরু হয়েছে । স্থানীয় প্রহরীরা একজন বৃদ্ধা মহিলাকে আসামী হিসেবে দরবারে হাজির করলেন । তার অপরাধ ছিল তিনি শহরের এক রেস্তারাঁ থেকে কিছু রুটি আর মধু চুরি করার সময় হাতেনাতে ধরা পরেন ।

বিচারক: আপনি চুরি করেছেন?

– জ্বি ।

– আপনি কি জানেন চুরি করা কতো বড় অপরাধ ও পাপ ?

– জ্বি ।

– জেনেও কেন চুরি করলেন ?

– কারণ আমি গত এক সপ্তাহ যাবত অনাহারে ছিলাম । আমার সাথে এতিম দু'নাতিও না খেয়ে ছিল । ওদের ক্ষুদারত চেহারা ও কান্না সহ্য করতে পারিনি তাই চুরি করেছি। আমার আর এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না হুজুর ।

বিচারক এবার পুরো দরবারে চোখবুলালেন। বললেন কাল যেন নগর, খাদ্য, শরিয়া, পুলিশ প্রধান ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যাক্তিগন সবাই উপস্থিত থাকেন । তখন এর রায় দেওয়া হবে ।

পর দিন সকালে সবাই হাজির হলেন । বিচারক ও যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে রায় ঘোষণা করলেন-" বৃদ্ধা মহিলার চুরির অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় ৫০টি চাবুক, ৫০০ দিণার রৌপ্য মুদ্রা আর অনাদায়ে এক বছর কারাদণ্ড দায়ের করা হলো। তবে অকপটে সত্য বলার কারণে হাত কাটা মাফ করা হলো। বিচারক প্রহরীকে চাবুক আনার নির্দেশ দিয়ে নিচে নেমে ঐ বৃদ্ধা মহিলার পাশাপাশি দাঁড়ালেন ।

বিচারক বললেন যে নগরে একজন ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ মহিলা না খেয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায় চুরি করতে বাধ্য হয় সেখানে তো সবচেয়ে বড় অপরাধী সে দেশের খলিফা। আর আমি এসেছি খলিফার প্রতিনিধি হয়ে । আমি যেহেতু তাঁর অধীনে চাকরি করি তাই ৫০টি চাবুকের ২০টি আমার হাতে মারা হউক । আর এটাই হলো বিচারকের আদেশ । আদেশ যেন পালন করা হয় এবং বিচারক হিসাবে আমার উপর চাবুক মারতে যেন কোনো রকম করুণা বা দয়া দেখানো না হয়।

বিচারক হাত বাড়িয়ে দিলেন । দুই হাতে পর পর ২০টি চাবুক মারা হলো। চাবুকের আঘাতের ফলে হাত থেকে রক্ত গড়িয়ে পরছে । ঐ অবস্থায় বিচারক পকেট থেকে একটি রুমাল বের করলেন । কেউ একজন বিচারকের হাত বাঁধার জন্য এগিয়ে গেলে বিচারক নিষেধ করেন। এরপর বিচারক বললেন " যে শহরে নগর প্রধান, খাদ্য গুদাম প্রধান ও অন্যান্য সমাজ হিতৈষীরা একজন অভাব গ্রস্হ মহিলার ভরন-পোষণ করতে পারেন না। সেই নগরে তারা ও অপরাধী। তাই বাকি ৩০টি চাবুক সমান ভাবে তাদেরকে মারা হোক ।"

এরপর বিচারক নিজ পকেট থেকে বের করা রুমালের উপর ৫০টি রৌপ্য মুদ্রা রাখলেন । তারপর বিচারপতি উপস্থিত সবাইকে বললেন "যে সমাজ একজন বৃদ্ধ মহিলাকে চোর বানায়, যে সমাজে এতিম শিশুরা উপবাস থাকে সে সমাজের সবাই অপরাধী । তাই উপস্থিত সবাইকে ১০০ দিণার রৌপ্য মুদ্রা জরিমানা করা হলো।"

এবার মোট ৫০০দিনার রৌপ্য মুদ্রা থেকে ১০০ দিণার রৌপ্য মুদ্রা জরিমানাবাবদ রেখে বাকি ৪০০টি রৌপ্য মুদ্রা থেকে ২০টি চুরি যাওয়া দোকানের মালিককে দেওয়া হলো। বাকি ৩৮০টি রৌপ্য মুদ্রা বৃদ্ধা মহিলাকে দিয়ে বললেন “ এগুলো আপনার ভরণ পোষণের জন্য । আর আগামী মাসে আপনি খলিফা হারুনুর রশিদের দরবারে আসবেন । খলিফা হারুনুর রশিদ আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থী । “

একমাস পরে বৃদ্ধা খলীফার দরবারে গিয়ে দেখেন ; খলীফার আসনে বসা লোকটিকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে । মহিলা ভয়ে ভয়ে খলীফার আসনের দিকে এগিয়ে যান। কাছে গিয়ে বুঝতে পারেন লোকটি সেদিনের সেই বিচারক। খলীফা চেয়ার থেকে নেমে এসে বললেন —আপনাকে ও আপনার এতিম দু’নাতিকে উপোস রাখার জন্য সেদিন বিচারক হিসেবে ক্ষমা চেয়েছিলাম । আজ দরবারে ডেকে এনেছি প্রজা অধিকার সমুন্নত করতে না পারা অধম এই খলীফাকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য ।আপনি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন ।

ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ :

কোরআন মাজীদের দাওয়াত ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব নৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে সর্বাধিক জোর দেয়া হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হলো ইনসাফ ও ন্যায়বিচার। আসলে এটি সততা ও সত্যাবাদিতারই এক বিশেষ প্রকার। এর মর্মার্থ হলো, প্রত্যেকটি লোকের সাথে পক্ষপাতহীন আচরণ করা এবং তার ব্যাপারে এমন সত্যনিষ্ঠ কথা বলা, বাস্তবে যে যার অধিকারী।

এই ন্যায়-নিষ্ঠার ওপরই সমগ্র জগৎ-সংসারের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা নির্ভরশীল। যে জাতি ও সমাজে ন্যায়বিচার থাকবে না, সেটি আল্লাহ তায়ালার রহমত ও করুণা থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং এজগতেও এর পরিণাম মন্দ হবে। কোরআন মাজীদ তার দাওয়াত ও শিক্ষায় ন্যায়বিচারের প্রতি যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে, তা সূরা হাদীদের একটি আয়াত থেকে অনুমান করা যায়।

ইরশাদ হয়েছে, 'আমি আমার রাসূলদের পাঠিয়েছি খোলাখুলি বিধান সহকারে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি (দিকনির্দেশনার) কিতাব ও ন্যায়বিচারের বাণী, যাতে করে মানুষ নিজেদের ব্যাপারে ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে।' (সূরা হাদীদ : আয়াত ২৫)।

এ আয়াতে 'আল মীযান' শব্দের মর্মার্থ হলো, ন্যায়বিচারের বিধান ও আইনকানুন। এই প্রেক্ষাপটে আয়াতের তাৎপর্য হলো এই যে, আল্লাহ তায়ালা তার নবী-রাসূলগণের সঙ্গে যেমন বিভিন্ন সহিফা (পুস্তিকা) অবতীর্ণ করেছেন, তেমনিভাবে ন্যায়বিচারের ফরমান ও আইনকানুনও নাজিল করেছেন। যাতে করে তার বান্দারা সেসব পুস্তক-পুস্তিকার আলোকে তার দাসত্ব ও বন্দেগীর পথে চলে এবং ন্যায়বিচারের বিধিবিধান অনুসারে পারস্পরিক ন্যায়ানুগ আচরণ করে।

যাহোক, এ আয়াতে আল মীযান তথা ন্যায়বিচারের উল্লেখ যেভাবে আল কিতাব শব্দের সাথে করা হয়েছে, তাতেই বোঝা যেতে পারে, আল্লাহ তায়ালার নজরে কোরআনী দাওয়াত ও শিক্ষায় ন্যায়বিচারের গুরুত্ব কতখানি।
কোরআনের অন্যত্র আল্লাহর কিতাবের সাথে ন্যায়বিচার সংক্রান্ত একটি ফরমান এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা শুরায় মহানবী সা.-এর প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে, 'হে নবী, আপনি (এসব ইহুদি-খ্রিষ্টানদের) বলে দিন, আমি ঈমান এনেছি সেই পবিত্র কিতাবের প্রতি, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে, যেন আমি তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করি। আল্লাহ আমাদের মালিক এবং তোমাদেরও।' (সূরা শুরা : আয়াত ১৫)।

এ আয়াতেও ন্যায়বিচার সংক্রান্ত ফরমানের আলোচনা যেভাবে কিতাবের প্রতি ঈমান আনার সাথে মিশিয়ে করা হয়েছে, তা কোরআনের ইঙ্গিত বিশারদদের পক্ষে এ কথা উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট যে, কোরআনী দাওয়াত ও শিক্ষায় ন্যায়বিচারের গুরুত্ব কতখানি। এ কারণেই সূরা নাহলের যেখানে ঈমানদারদের অতি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ও চারিত্রিক বিধিমালা দেয়া হয়েছে, সেখানে সর্বাগ্রে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সে রুকুটি শুরুই হয়েছে এভাবে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা হুকুম দিচ্ছেন ন্যায়বিচারের এবং সদ্ব্যবহারের।' (সূরা নাহল : আয়াত ৯০)।

এ ছাড়া সূরা আন'আমের যেখানে আল্লাহ তায়ালা বিধিনিষেধসমূহকে একত্রে বর্ণনা করেছেন, সেখানেও ন্যায়বিচারের তাকিদ করে বলা হয়েছে, 'যখন কোনো (বিবদমান) বিষয়ে তোমাদের কোনো কিছু বলতে কিংবা মীমাংসা করতে হয়, তখন ন্যায়বিচার করবে যদিও (বিবদমান পক্ষ) তোমাদের কোনো নিকটাত্মীয় হয়।' (সূরা আনআম : আয়াত ১৫২)।

সূরা নিসার এক আয়াতে আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, নিরবচ্ছিন্ন ন্যায়পরায়ণ হওয়া ও আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য সাক্ষ্য দান করা ঈমানদারদের জন্য ফরজ। যদিও তাতে সে নিজে কিংবা তার পিতা-মাতা অথবা তার আত্মীয়-আপনজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইরশাদ হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ, ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও এবং ইনসাফের সমর্থক ও আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য সাক্ষ্যদানকারী থাক, যদিও (সে সত্য সাক্ষ্য ও ন্যায়নিষ্ঠা) তোমাদেরই বিরুদ্ধে যায় কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে যায়।

বিবদমান পক্ষদ্বয় বিত্তবান হোক কিংবা বিত্তহীন (উভয় অবস্থাতেই) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের চাইতে তাদের অধিক কল্যাণকামী। কাজেই তোমরা ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে নিজের নফস (রিপু)-এর অনুসরণ করো না। যদি তোমরা (কারো আত্মীয়তা কিংবা দারিদ্র্য-ধনীত্বের প্রেক্ষাপটে বিচার মীমাংসা বা সাক্ষ্যদানে) হেরফের বা ঘোরঘাপলা করো কিংবা ন্যায়ানুগ কথা বলতে পাশ কাটিয়ে যাও, তাহলে নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত।' (সূরা নিসা : ১৩৫)।

ন্যায় বিচারের প্রতিদান :

হজরত দাউদ (আ.)কে উদ্দেশ করে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হে দাউদ, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে যথাযথভাবে বিচার করো'। (সূরা সোয়াদ : ২৬)। বদরের যুদ্ধে অনেক কাফির মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়।

রাসূল (সা.) বলেন, ‘তোমরা বন্দিদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো’। অতঃপর আল্লাহর নবি (সা.)-এর এ নির্দেশের পর মুসলমানরা তাদের খাদ্যবস্তু রুটি না খেয়ে শুধু খেজুর খেয়ে ওই রুটি বন্দিদের খেতে দিয়েছিলেন। (আল-ওয়াকিদি)। হজরত আলী (রা.) বলেন, ‘রাসূল (সা.) আমাকে ইয়েমেনের বিচারক হিসাবে প্রেরণ করেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূল! আপনি আমাকে ইয়েমেনের বিচারক হিসাবে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমি একজন যুবক। আর বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা নেই’।
.তিনি বলেন, আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমার অন্তরকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে পথ দেখাবেন এবং তোমাকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। যখন তোমার কাছে মানুষ বিচার-ফয়সালার জন্য আসবে, তখন তুমি যেভাবে একপক্ষের বক্তব্য শুনবে তেমনি অপর পক্ষের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেবে না। এতে তোমার সামনে মোকদ্দমার আসল সত্য প্রকাশিত হবে। আলী (রা.) বলেন, অতঃপর আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সন্দেহে পতিত হইনি’।

ইবনে বুরাইদাহ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেন, ‘বিচারক তিন ধরনের। এক ধরনের বিচারক জান্নাতি এবং অপর দুই ধরনের বিচারক জাহান্নামি। জান্নাতি বিচারক হলো, যে সত্যকে বুঝে ফয়সালা দেয়। আর যে বিচারক সত্যকে জানার পরও স্বীয় বিচারে জুলুম করে সে জাহান্নামি এবং যে বিচারক অজ্ঞতাপ্রসূত ফয়সালা দেয় সেও জাহান্নামি’।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) খেবে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘যেদিন আল্লাহর রহমতের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন (কিয়ামতের দিন) মহান আল্লাহতায়ালা সাত ব্যক্তিকে আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। সে সাত ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি হলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক’।
ইনসাফের নিয়তে বিচারক সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও সওয়াবের কথা বলা হয়েছে হাদিসে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘বিচারক যখন তার বিচারকার্য করে এবং আলোচ্য বিষয়ে চূড়ান্ত প্রয়াস পায়, অতঃপর যদি তার রায় সঠিক হয় তবে তার জন্য দুটি সওয়াব। আর যদি সে বিচারে ভুল করে তবে তার জন্য একটি সওয়াব’।

ন্যায়বিচার না করার কারণে পৃথিবীতে অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। ন্যায়ের বিধান সর্বকালের ও সব শ্রেণির পেশার মানুষের জন্য সমান। সব আসমানি কিতাবেও এ নির্দেশনা রয়েছে। নবিজি (সা.) নিজেও আজীবন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এমনকি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় পূর্ববর্তী নবি-রাসূলদের ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার উপকারিতা :

সামাজিক জীবনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ যেমন ন্যায়বিচারক তেমনি মানবজাতিকে তাদের জীবনের সবদিকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

ন্যায়বিচারের পরিচয়আরবি আদল শব্দের অর্থ হলো ন্যায়বিচার। তাই ন্যায়বিচার হলো- আদল, ইনসাফ করা, ভারসাম্য রক্ষা করা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তে ন্যায়বিচার হলো- কোনো বস্তুকে সমান অংশের অধিকারীদের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া, যাতে কারো অংশ বিন্দু পরিমাণও কম বা বেশি না হয়। অর্থাৎ যার যতটুকু প্রাপ্য আছে, তা আদায়ের জন্য সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার নাম 'ন্যায়বিচার'। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ন্যায়বিচারের গুরুত্বমানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ, বিচার-ফয়সালা, লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয়, যুদ্ধ-সন্ধি, ভোগ-ব্যবহারে সততা, ন্যায়-নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার নামই ন্যায়বিচার। সুষ্ঠু সমাজ বিকাশে তথা ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি ভিত্তিক আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ন্যায়বিচারের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, আদল বা ন্যায়বিচারই হচ্ছে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ, সামাজিক শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সমাজ সংরক্ষণ, শাসন পরিচালনা এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ রক্ষা ও উন্নয়নের প্রতিটি প্রেক্ষাপটে- 'ন্যায়বিচারের' প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সুফল১. ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠাযে সমাজে ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসন আছে সেখানে প্রতিটি মানুষের জান-মাল, মানসম্মান ও অধিকার নিরাপদ। কেউ

অন্যায় বা অপরাধ করলে যদি উপযুক্ত বিচার-ফয়সালা করা হয়। ন্যায়বিচার করা হয়; কারো পক্ষপাতিত্ব করা না হয়; কেবল তখনই সে সমাজে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা হতে পারে। এ জন্য মহান আল্লাহ তাআলা এ মর্মে নির্দেশ দেন

وَ اِذَا حَكَمۡتُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ اِ-

..‘نَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمۡ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيۡعًۢا بَصِيۡرًا

. আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে কতইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।’ (সুরা নিসা : আয়াত ৫৮)

২. সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাসমাজ জীবনে মানুষকে অনেক সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরোধী তৎপরতা যেমন- চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, ছিনতাই, খুন-খারাবি, হত্যা-লুণ্ঠন, জুলুম, অত্যাচার, অনাচার, অবিচার-ব্যভিচার, শোষণ-নিপীড়ন ইত্যাদি কার্যকলাপ সমাজকে কলুষিত ও বিপর্যস্ত করে তোলে। এ সব সামাজিক অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়; তবে সে সমাজে অন্যায় ও অপরাধ প্রবণতা সংক্রামক ব্যাধির মত বিস্তার লাভ করবে। ফলে সে সমাজের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে। সে সমাজ আর মানুষের বাসোপযোগী থাকে না। সুতরাং সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা একান্ত অপরিহার্য।

৩. অধিকার প্রতিষ্ঠাসমাজের শক্তিশালীরা যেন দুর্বলের ওপর অত্যাচার করতে না পারে; অন্যের সম্পদ যাতে জোরপূর্বক ভোগ-দখল করে নিতে না পারে; সবাই যেন পুর্ণ মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, সেজন্য সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন।

৪. ব্যবসা-বাণিজ্যেমানুষের অর্থনৈতিক জীবনে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও লেন-দেনে সুষ্ঠু অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ন্যায়বিচারের গুরুত্ব সীমাহীন। দ্রব্য-সামগ্রীতে ভেজাল দেওয়া, ওজনে কম-বেশি করা, পণ্যের ত্রুটি গোপন করে বাজারজাত করা- এ সবই ব্যবসায়িক অসাধুতা সুষ্ঠু অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা-وَ اَوۡفُوا الۡكَيۡلَ وَ-

...‘الۡمِيۡزَانَ بِالۡقِسۡطِ ۚ

আর পরিমাপ ও ওজন ইনসাফের সঙ্গে পরিপূর্ণ দেবে।... (সুরা আনআম : আয়াত ১৫২)

৫. প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারসমাজ বা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থাকে মজবুত ও সুসংহত রাখতে অবশ্যই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। ন্যায়বিচার পরিপন্থী প্রশাসন ব্যবস্থা বেশি দিন টিকতে পারে না। একসময় প্রশাসনের প্রতি জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ফলে প্রশাসনিক অবকাঠামো ভেঙে যায়। তাই প্রশাসনিক মজবুতী ও সুষ্ঠুতার জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম।

৬. সাম্য প্রতিষ্ঠায় ন্যায়বিচারসমাজের সকল কর্মকাণ্ড যদি ন্যায়বিচারের সঙ্গে হয়, তবে সমাজের প্রতিটি লোকের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত হয়। ন্যায়বিচার বা ন্যায়দণ্ডের ছায়াতলে সবাই ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে ন্যায়বিচারের অভাবে প্রতিহিংসা দানা বাঁধতে থাকে এবং ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হয়। ফলে একটা সময় চরম পরিণতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেন-اِنَّ اللهَ يَاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ وَ الۡاِحۡسَانِ وَ اِيۡتَآیِٔ ذِی الۡقُرۡبٰی وَ يَنۡهٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَ الۡمُنۡكَرِ وَ الۡبَغۡیِ ۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُوۡنَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, ন্যায়বিচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি আশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।' (সুরা নাহল : আয়াত ৯০)

৭. সাক্ষ্য ও বিচারকার্যে ন্যায়বিচারআল্লাহর দেওয়া আইন (কোরআন) ও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী বিচারকার্যে এবং সাক্ষ্য প্রদানে শত্রু-মিত্র, বন্ধু-বান্ধব, নিকটাত্মীয়, বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে, আপন-পর, উঁচু-নিচু, ইতর-ভদ্র, জাতি-ধর্ম গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার প্রতিই সমান আচরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। এ মর্মে মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন-يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوّٰمِيۡنَ بِالۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوۡ عَلٰۤی اَنۡفُسِكُمۡ اَوِ الۡوَالِدَيۡنِ وَ الۡاَقۡرَبِيۡنَ ۚ اِنۡ يَّكُنۡ غَنِيًّا اَوۡ فَقِيۡرًا فَاللّٰهُ اَوۡلٰی بِهِمَا ۟ فَلَا تَتَّبِعُوا الۡهَوٰۤی اَنۡ تَعۡدِلُوۡا ۚ وَ اِنۡ تَلۡوٗۤا اَوۡ تُعۡرِضُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرًا

'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজদের কিংবা বাবা-মার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। যদি

সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়ের ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমরা যা কর সে বিষয়ে সম্যক অবগত।' (সুরা নিসা : আয়াত ১৩৫)

৮. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ন্যায়বিচারন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। শুধু তা-ই নয় আল্লাহ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারীকে ভালোবাসেন। মহান আল্লাহর ঘোষণাও এমনই-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوّٰمِيۡنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالۡقِسۡطِ ۫ وَ لَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَاٰنُ قَوۡمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعۡدِلُوۡا ‘اِعۡدِلُوۡا ۟ هُوَ اَقۡرَبُ لِلتَّقۡوٰى ۫ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ۝

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দন্ডায়মান হও। কোন কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।' (সুরা মায়েদা : আয়াত ৮)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন বলেন ঘোষণা দেন

‘ فَاِنۡ فَآءَتۡ فَاَصۡلِحُوۡا بَيۡنَهُمَا بِالۡعَدۡلِ وَ اَقۡسِطُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُقۡسِطِيۡنَ-..

. তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সঙ্গে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন।' (সুরা হুজরাত : আয়াত ৯)

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব কতবেশি, তা একটি হাদিস থেকেই প্রমাণিত। পরকালে ৭ শ্রেণির লোক আল্লাহর আরশের নিচে স্থান পাবেন। তার মধ্যে প্রথম শ্রেণি হলো- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী ইমামগণ। এর চেয়ে বড় সুখবর আর কী হতে পারে।

শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ন্যায়বিচার :

সমাজে সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করছে। মানুষের জান-মাল ও ইযযতের নিরাপত্তা নেই। দু'বছরের বাচ্চা থেকে শতবর্ষী অন্ধ বৃদ্ধা পর্যন্ত ধর্ষিতা হচ্ছে। ইয়াবা সর্বত্র হাতের নাগালে এসে যাচ্ছে। তুচ্ছ কারণে মানুষ খুন হচ্ছে। প্রকাশ্যে দিনমানে শত শত লোকের সামনে মানুষকে কুপিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছে। কিশোর অপরাধ কল্পনাতীত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বড়-ছোট ভেদাভেদ নেই। মানীর মান নেই। মা-বোন জ্ঞান নেই। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন সব নোংরা ঘটনা ঘটছে অহরহ। ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, সমাজে সর্বত্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। কৃষক মূল্য না পেয়ে ধান পুড়িয়ে দিচ্ছে। খামারী দুধ মাটিতে ঢেলে দিচ্ছে। সন্তানের দুধ কিনতে না পারায় বয়স্ক অভাবী পিতা দোকান থেকে দুধের প্যাকেট চুরি করছে। ঈদের জামা কেনার আব্দার পূরণ করতে না পেরে ক্ষুধায় তাড়িত পিতা ৫ ও ৭ বছরের দুই কন্যা সন্তানকে বাযারে নিয়ে টয়লেটে ঢুকিয়ে গলা টিপে হত্যা করছে। দুই কোটির উপরে শিক্ষিত বেকার যুবক হতাশায় ভুগছে। স্বাধীন দেশে এগুলি কেউ ভাবতেও পারেনি। অথচ এটাই বাস্তব। এর ফলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, তরুণ শ্রেণী স্বপ্ন দেখতে ভয় পাচ্ছে। অথচ তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদেরকে স্বপ্ন দেখাতেই হবে। তাদেরকে সাহসী করতেই হবে।

প্রসিদ্ধ আছে যে, ওমর ফারূক খলীফা (১৩-২৩ হি.) হওয়ার পর জনগণকে ডেকে বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে আল্লাহর পথে না চালাই, তাহ'লে তোমরা কি করবে? একবার দু'বার তিনবারের পর একজন যুবক উঠে দাঁড়িয়ে তরবারি উঁচিয়ে বলল, এই তরবারি আপনাকে সোজা করবে। ওমর (রাঃ) শুকরিয়া আদায় করে বললেন, ঐ জাতি কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, যে জাতির মধ্যে এমন সৎসাহসী তরুণ রয়েছে'। ওমর (রাঃ) একদিন খুৎবায় বললেন, বিয়ের সময় নারীদের অধিক মোহর দেওয়া যাবে না। মসজিদে উপস্থিত একজন মহিলা কুরআনের আয়াত (নিসা ২০) পড়ে বলে উঠল, হে খলীফা! আল্লাহ আমাদের যে অধিকার দিয়েছেন, আপনি তা ছিনিয়ে নিতে পারেন না। ওমর (রাঃ) তার আদেশ প্রত্যাহার করলেন ও অল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন'। রাষ্ট্রপ্রধানের সামনে এরূপ বাক স্বাধীনতা কল্পনাতীত। জাহেলী আরবের স্বেচ্ছাচারী সমাজ এমনি করে নিয়ন্ত্রিত সমাজে পরিণত হয় স্রেফ আল্লাহ ও আখেরাতে

জবাবদিহিতার ভয়ে। আজও তা সম্ভব, যদি প্রশাসন ও সমাজনেতারা উপরোক্ত নীতির অনুসারী হন।

শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার উপায় হল ২টি : অনুশাসন ও সুশাসন। এর মধ্যে অনুশাসন বা উপদেশ হল মূল। যার মাধ্যমে মানুষের আক্বীদা পরিবর্তন হয়। আর তার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন হয়। লক্ষাধিক নবী-রাসূল প্রধানতঃ এ কাজটিই করে গেছেন। যদিও আল্লাহর বিশেষ রহমতে ইউসুফ, দাঊদ, সুলায়মান ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন।

সুশাসনের ভিত্তি হল ৪টি : দ্বীন, ন্যায়বিচার, পরামর্শ গ্রহণ ও সমৃদ্ধ কোষাগার। এগুলির মধ্যে প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হল দ্বীন। দ্বীন না থাকলে বাকীগুলি অর্থহীন। দ্বীনদার সমাজে মনুষ্যত্ব নিরাপদ থাকে। বেদ্বীন সমাজে মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়। আর প্রশাসন দ্বীনদার হ'লে তার প্রভাবে সমাজ দ্রুত পরিবর্তিত হয় (হজ্জ ৪১)। দ্বীন হল সমাজের দেওয়াল স্বরূপ। দ্বীন থাকলে সমাজ আপনা থেকেই নিরাপদ ও সুশৃংঙ্খল থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন বললেন, আল্লাহ অবশ্যই ইসলামী শাসনকে পূর্ণতা দান করবেন। তখন অবস্থা এমন শান্তিময় হবে যে, ইরাকের হীরা নগরীর একজন গৃহবধূ নিজ বাহনে সওয়ার হয়ে একাকী কা'বাগৃহ তাওয়াফ করবে ও একাকী ফিরে আসবে, অথচ সে কাউকে ভয় পাবে না আল্লাহ ব্যতীত' (বুঃ মিশকাত হা/৫৮৫৮)। এই নিরাপদ সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে। পরবর্তীকালেও তা কমবেশী অব্যাহত ছিল।

২য় ভিত্তি হল ন্যায়বিচার : এটিই প্রকৃত শান্তির দুয়ার ও সমাজের রক্ষা কবচ। এটা না থাকলে সমাজ নিরাপত্তাহীন হবে। শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হবে। আল্লাহ স্বীয় নবী দাঊদকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে দাঊদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে শাসক নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়বিচার কর। আর তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কারণ তারা বিচার দিবসকে ভুলে যায়' (ছোয়াদ ২৬)। উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ান (৬৫-৮৬ হি.) তার পুত্রদের বলেন, তোমরা প্রত্যেকেই এই শাসন ক্ষমতার যোগ্যতা রাখ। ... মনে রেখ, ন্যায়বিচার হল কঠোর শাসনের বহিঃপ্রকাশ, কঠোর শাস্তি প্রয়োগ

নয়’। অতএব গুম, খুন, অপহরণ, ক্রস ফায়ার, বন্দুক যুদ্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করে সমাজে কখনো সুশাসন ফিরে আসবে না, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত। একবার জনৈক কর্মকর্তা তার শহরের চারপাশে প্রাচীর দেওয়ার অনুমতি চেয়ে খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীযের (৯৯-১০১ হি.) নিকট পত্র পাঠান। জবাবে খলীফা তাকে লেখেন, তুমি তোমার নগরীকে ন্যায়বিচার দ্বারা প্রাচীর দাও এবং এর রাস্তাগুলিকে যুলুম থেকে পরিচ্ছন্ন কর’ (হিলইয়াতুল আউলিয়া ৫/৩০৫)। একবার বাদশাহ ইস্কান্দার একটি ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে প্রশ্ন করেন, তোমাদের দেশে পুলিশের সংখ্যা কম কেন? তারা বলল, আমাদের পরস্পরের হক বুঝে দেওয়ার কারণে এবং আমাদের শাসকদের ন্যায়বিচার ও আমাদের সাথে তাদের সুন্দর আচরণের কারণে’ (মুহাযারাতুল আবরার ১/২৮৮ পৃ.)।

ন্যায়বিচারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল দল ও স্বজনপ্রীতি। এ থেকে নিষেধ করে আল্লাহ বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী’ (মায়েদাহ ৮)। ইবনু ওমর বলেন, আমার পিতা ওমর যখন লোকদের কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করতেন, তখন নিজের পরিবারের সবাইকে জমা করে বলতেন, আমি লোকদের অমুক অমুক কাজে নিষেধ করেছি। তারা তোমাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে এমনভাবে, যেভাবে পাখি গোশতের দিকে তাকিয়ে থাকে। যদি তোমরা ঐ কাজ কর, তাহ’লে তারা তা করবে। আর যদি বিরত থাক, তাহ’লে তারা বিরত থাকবে। আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ যদি আমার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে, তাহ’লে আমি তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেব (মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক)। একবার এক মুসলিম ও ইহূদী তাঁর দরবারে বিচার প্রার্থী হল। তিনি রায় দিলেন ইহূদীর পক্ষে। এতে ইহূদী খুশী হয়ে বলে উঠল, আল্লাহর কসম! আপনি ন্যায়বিচার করেছেন। তখন ওমর তাকে বেত্রাঘাত করে বললেন, কিভাবে তুমি বুঝলে? ইহূদী বলল, আল্লাহর কসম! আমরা তওরাতে পেয়েছি যে, যখন কোন ন্যায়বিচারক ন্যায়বিচার করেন, তখন তার ডাইনে ও বামে দু’জন ফেরেশতা থাকেন, যারা তাকে সঠিক পথের দিশা দেন ও ন্যায়বিচারে সাহস যোগান। কিন্তু যখনই তিনি ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করেন, তখনই তারা তাকে ছেড়ে চলে যান’ (মালেক, মিশকাত হা/৩৭৪২)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ ছায়া দিবেন। তাদের প্রথম ব্যক্তি হ’লেন ন্যায়বিচারক নেতা বা শাসক... (বুঃ

মুঃ মিশকাত হা/৭০১)। তিনি বলেন, যদি কেউ এক বিঘত পরিমাণ যুলুম করে, তার গর্দানে ক্বিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের বেড়ী পরানো হবে' (বুখারী হা/৩১৯৫)। তিনি আরও বলেন, ন্যায়বিচারকগণ আল্লাহর ডান পার্শ্বে নূরের আসন সমূহে বসবেন। আর আল্লাহর দুই হাতই ডান হাত। যারা তাদের প্রশাসনে, পরিবারে ও অধীনস্তদের মধ্যে ন্যায়বিচার করেন' (মুঃ মিশকাত হা/৩৬৯০)। আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা তাদের উপর বিধিবদ্ধ করেছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখম সমূহের বদলে যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সেটি তার জন্য কাফফারা হয়ে যায়। বস্ততঃ যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা যালেম' (মায়েদাহ ৪৫)।

সমাজে সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করছে। মানুষের জান-মাল ও ইযযতের নিরাপত্তা নেই। দু'বছরের বাচ্চা থেকে শতবর্ষী অন্ধ বৃদ্ধা পর্যন্ত ধর্ষিতা হচ্ছে। ইয়াবা সর্বত্র হাতের নাগালে এসে যাচ্ছে। তুচ্ছ কারণে মানুষ খুন হচ্ছে। প্রকাশ্যে দিনমানে শত শত লোকের সামনে মানুষকে কুপিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছে। কিশোর অপরাধ কল্পনাতীত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বড়-ছোট ভেদাভেদ নেই। মানীর মান নেই। মা-বোন জ্ঞান নেই। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন সব নোংরা ঘটনা ঘটছে অহরহ। ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, সমাজে সর্বত্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। কৃষক মূল্য না পেয়ে ধান পুড়িয়ে দিচ্ছে। খামারী দুধ মাটিতে ঢেলে দিচ্ছে। সন্তানের দুধ কিনতে না পারায় বয়স্ক অভাবী পিতা দোকান থেকে দুধের প্যাকেট চুরি করছে। ঈদের জামা কেনার আব্দার পূরণ করতে না পেরে ক্ষুধায় তাড়িত পিতা ৫ ও ৭ বছরের দুই কন্যা সন্তানকে বাযারে নিয়ে টয়লেটে ঢুকিয়ে গলা টিপে হত্যা করছে। দুই কোটির উপরে শিক্ষিত বেকার যুবক হতাশায় ভুগছে। স্বাধীন দেশে এগুলি কেউ ভাবতেও পারেনি। অথচ এটাই বাস্তব। এর ফলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, তরুণ শ্রেণী স্বপ্ন দেখতে ভয় পাচ্ছে। অথচ তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদেরকে স্বপ্ন দেখাতেই হবে। তাদেরকে সাহসী করতেই হবে।

প্রসিদ্ধ আছে যে, ওমর ফারূক খলীফা (১৩-২৩ হি.) হওয়ার পর জনগণকে ডেকে বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে আল্লাহর পথে না চালাই, তাহ'লে তোমরা কি করবে? একবার দু'বার তিনবারের পর একজন যুবক উঠে দাঁড়িয়ে তরবারি উঁচিয়ে বলল, এই

তরবারি আপনাকে সোজা করবে। ওমর (রাঃ) শুকরিয়া আদায় করে বললেন, ঐ জাতি কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, যে জাতির মধ্যে এমন সৎসাহসী তরুণ রয়েছে'। ওমর (রাঃ) একদিন খুৎবায় বললেন, বিয়ের সময় নারীদের অধিক মোহর দেওয়া যাবে না। মসজিদে উপস্থিত একজন মহিলা কুরআনের আয়াত (নিসা ২০) পড়ে বলে উঠল, হে খলীফা! আল্লাহ আমাদের যে অধিকার দিয়েছেন, আপনি তা ছিনিয়ে নিতে পারেন না। ওমর (রাঃ) তার আদেশ প্রত্যাহার করলেন ও অল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন'। রাষ্ট্রপ্রধানের সামনে এরূপ বাক স্বাধীনতা কল্পনাতীত। জাহেলী আরবের স্বেচ্ছাচারী সমাজ এমনি করে নিয়ন্ত্রিত সমাজে পরিণত হয় স্রেফ আল্লাহ ও আখেরাতে জবাবদিহিতার ভয়ে। আজও তা সম্ভব, যদি প্রশাসন ও সমাজনেতারা উপরোক্ত নীতির অনুসারী হন।

শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার উপায় হল ২টি : অনুশাসন ও সুশাসন। এর মধ্যে অনুশাসন বা উপদেশ হল মূল। যার মাধ্যমে মানুষের আক্বীদা পরিবর্তন হয়। আর তার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন হয়। লক্ষাধিক নবী-রাসূল প্রধানতঃ এ কাজটিই করে গেছেন। যদিও আল্লাহর বিশেষ রহমতে ইউসুফ, দাঊদ, সুলায়মান ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন।

সুশাসনের ভিত্তি হল ৪টি : দ্বীন, ন্যায়বিচার, পরামর্শ গ্রহণ ও সমৃদ্ধ কোষাগার। এগুলির মধ্যে প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হল দ্বীন। দ্বীন না থাকলে বাকীগুলি অর্থহীন। দ্বীনদার সমাজে মনুষ্যত্ব নিরাপদ থাকে। বেদ্বীন সমাজে মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়। আর প্রশাসন দ্বীনদার হ'লে তার প্রভাবে সমাজ দ্রুত পরিবর্তিত হয় (হজ্জ ৪১)। দ্বীন হল সমাজের দেওয়াল স্বরূপ। দ্বীন থাকলে সমাজ আপনা থেকেই নিরাপদ ও সুশৃংঙ্খল থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন বললেন, আল্লাহ অবশ্যই ইসলামী শাসনকে পূর্ণতা দান করবেন। তখন অবস্থা এমন শান্তিময় হবে যে, ইরাকের হীরা নগরীর একজন গৃহবধূ নিজ বাহনে সওয়ার হয়ে একাকী কা'বাগৃহ তাওয়াফ করবে ও একাকী ফিরে আসবে, অথচ সে কাউকে ভয় পাবে না আল্লাহ ব্যতীত' (বুঃ মিশকাত হা/৫৮৫৮)। এই নিরাপদ সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে। পরবর্তীকালেও তা কমবেশী অব্যাহত ছিল।

২য় ভিত্তি হল ন্যায়বিচার : এটিই প্রকৃত শান্তির দুয়ার ও সমাজের রক্ষা কবচ। এটা না থাকলে সমাজ নিরাপত্তাহীন হবে। শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হবে। আল্লাহ স্বীয় নবী দাঊদকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে দাঊদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে শাসক নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়বিচার কর। আর তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কারণ তারা বিচার দিবসকে ভুলে যায়' (ছোয়াদ ২৬)। উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ান (৬৫-৮৬ হি.) তার পুত্রদের বলেন, তোমরা প্রত্যেকেই এই শাসন ক্ষমতার যোগ্যতা রাখ। ... মনে রেখ, ন্যায়বিচার হল কঠোর শাসনের বহিঃপ্রকাশ, কঠোর শাস্তি প্রয়োগ নয়'। অতএব গুম, খুন, অপহরণ, ক্রস ফায়ার, বন্দুক যুদ্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করে সমাজে কখনো সুশাসন ফিরে আসবে না, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত। একবার জনৈক কর্মকর্তা তার শহরের চারপাশে প্রাচীর দেওয়ার অনুমতি চেয়ে খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীযের (৯৯-১০১ হি.) নিকট পত্র পাঠান। জবাবে খলীফা তাকে লেখেন, তুমি তোমার নগরীকে ন্যায়বিচার দ্বারা প্রাচীর দাও এবং এর রাস্তাগুলিকে যুলুম থেকে পরিচ্ছন্ন কর' (হিলইয়াতুল আউলিয়া ৫/৩০৫)। একবার বাদশাহ ইস্কান্দার একটি ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে প্রশ্ন করেন, তোমাদের দেশে পুলিশের সংখ্যা কম কেন? তারা বলল, আমাদের পরস্পরের হক বুঝে দেওয়ার কারণে এবং আমাদের শাসকদের ন্যায়বিচার ও আমাদের সাথে তাদের সুন্দর আচরণের কারণে' (মুহাযারাতুল আবরার ১/২৮৮ পৃ.)।

ন্যায়বিচারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল দল ও স্বজনপ্রীতি। এ থেকে নিষেধ করে আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী' (মায়েদাহ ৮)। ইবনু ওমর বলেন, আমার পিতা ওমর যখন লোকদের কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করতেন, তখন নিজের পরিবারের সবাইকে জমা করে বলতেন, আমি লোকদের অমুক অমুক কাজে নিষেধ করেছি। তারা তোমাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে এমনভাবে, যেভাবে পাখি গোশতের দিকে তাকিয়ে থাকে। যদি তোমরা ঐ কাজ কর, তাহ'লে তারা তা করবে। আর যদি বিরত থাক, তাহ'লে তারা বিরত থাকবে। আল্লাহর কসম!

তোমাদের কেউ যদি আমার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে, তাহ’লে আমি তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেব (মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক)। একবার এক মুসলিম ও ইহূদী তাঁর দরবারে বিচার প্রার্থী হল। তিনি রায় দিলেন ইহূদীর পক্ষে। এতে ইহূদী খুশী হয়ে বলে উঠল, আল্লাহর কসম! আপনি ন্যায়বিচার করেছেন। তখন ওমর তাকে বেত্রাঘাত করে বললেন, কিভাবে তুমি বুঝলে? ইহূদী বলল, আল্লাহর কসম! আমরা তওরাতে পেয়েছি যে, যখন কোন ন্যায়বিচারক ন্যায়বিচার করেন, তখন তার ডাইনে ও বামে দু’জন ফেরেশতা থাকেন, যারা তাকে সঠিক পথের দিশা দেন ও ন্যায়বিচারে সাহস যোগান। কিন্তু যখনই তিনি ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করেন, তখনই তারা তাকে ছেড়ে চলে যান’ (মালেক, মিশকাত হা/৩৭৪২)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ ছায়া দিবেন। তাদের প্রথম ব্যক্তি হ’লেন ন্যায়বিচারক নেতা বা শাসক... (বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৭০১)। তিনি বলেন, যদি কেউ এক বিঘত পরিমাণ যুলুম করে, তার গর্দানে ক্বিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের বেড়ী পরানো হবে’ (বুখারী হা/৩১৯৫)। তিনি আরও বলেন, ন্যায়বিচারকগণ আল্লাহর ডান পার্শ্বে নূরের আসন সমূহে বসবেন। আর আল্লাহর দুই হাতই ডান হাত। যারা তাদের প্রশাসনে, পরিবারে ও অধীনস্তদের মধ্যে ন্যায়বিচার করেন’ (মুঃ মিশকাত হা/৩৬৯০)। আল্লাহ বলেন, ‘আর আমরা তাদের উপর বিধিবদ্ধ করেছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখম সমূহের বদলে যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সেটি তার জন্য কাফফারা হয়ে যায়। বস্ততঃ যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা যালেম’ (মায়েদাহ ৪৫)।

একবার জনৈক ইহূদী একজন মুসলিম মহিলার মাথা থেঁতলে দেয়। বিচারে রাসূল (ছাঃ) ঐ ইহূদীর মাথা থেঁতলে দেওয়ার আদেশ দেন এবং তা প্রতিপালিত হয় (বুঃ মিশকাত হা/৩৪৫৯)। একবার রাসূল (ছাঃ)-এর গোলাম ও প্রিয়তম ছাহাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর চাচাতো বোন অন্য এক মহিলার দাঁত ভেঙ্গে দেয়। বিনিময়ে রাসূল (ছাঃ) তার দাঁত ভেঙ্গে দিতে বলেন। এতে আনাস (রাঃ)-এর চাচা বলে ওঠেন, আল্লাহর কসম! মহিলার দাঁত ভাঙ্গা হবেনা। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটা আল্লাহর নির্দেশ। তখন তারা রাযী হল এবং ‘দিয়াত’ বা রক্তমূল্য দিয়ে খুশী করলে বাদীনী তার দাবী উঠিয়ে নিলেন। ফলে তার দন্ড মওকূফ হল’ (বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৪৬০)। একবার মক্কার সম্ভ্রান্ত বংশ বনু মাখযূমের জনৈকা মহিলা চুরির অপরাধে ধরা পড়ল।

তখন সবাই তাকে বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। অবশেষে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয় নাতি উসামা বিন যায়েদকে গিয়ে তারা ধরলেন যাতে উসামা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে সুফারিশ করে। এ খবর জানতে পেয়ে রাসূল (ছাঃ) সবাইকে ডেকে ভাষণ দিয়ে বললেন, তোমাদের পূর্বেকার উম্মত (ইহূদী-নাছারা) অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে একারণে যে, যখন তাদের কোন সম্ভ্রান্ত লোক অপরাধ করত, তখন তাকে শাস্তি দিত না। কিন্তু কোন দুর্বল লোক অপরাধ করলে তার উপর দন্ড প্রয়োগ করত। মনে রেখ, মুহাম্মাদ কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করে, আমি তার হাত কেটে দেব' (বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬১০)। তিনি বলেন, যদি কেউ দুনিয়াতে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে শাস্তি প্রাপ্ত হয়, তাহ'লে আখেরাতে এটি তার জন্য কাফফারা হবে' (বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৮)। এ কারণেই ব্যভিচারী পুরুষ মা'এয আসলামী ও ব্যভিচারী গামেদী নারী স্বেচ্ছায় এসে মৃত্যুদন্ডের মত কঠোর শাস্তি গ্রহণ করেছিল জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার আশায় (মুঃ মিশকাত হা/৩৫৬২)। অতএব দুনিয়াতে পাপমুক্ত হয়ে পরকালীন জীবনে প্রবেশ করাই হল বিচক্ষণ মুমিনের কর্তব্য (ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯)। নইলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মানুষকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। তাঁর বিচারে কোন যুলুম থাকবে না। সেদিন প্রত্যেক পাওনাদার তার হক পুরোপুরি বুঝে পাবে (বাক্বারাহ ২৮১)।

মনে রাখা আবশ্যক যে, দায়িত্বশীলের গুণাবলী ৫টি : (১) দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে আখেরাত কামনা করা (২) দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা (৩) দায়িত্বকে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসাবে গণ্য করা এবং তার যথাযথ শুকরিয়া আদায় করা (৪) আল্লাহর অনুগ্রহ পেয়ে বিনয়ী হওয়া এবং উদ্ধত না হওয়া (৫) কর্মস্থলে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা। যারা মুখে বলবে আমরা শান্তিপ্রিয় এবং সংশোধনকামী' (ক্বাছাছ ৭৭-৭৮ ও বাক্বারাহ ১১-১২ আয়াতের শিক্ষণীয়)।

দায়িত্বশীলগণ যদি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করেন, তাদের পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ যখন তার কোন বান্দাকে লোকদের উপরে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন, অতঃপর সে তার দায়িত্ব পালনে খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন (মুসলিম হা/১৪২)। অতএব যিনি যে পর্যায়ের দায়িত্বশীল, তাকে স্ব স্ব দায়িত্বের কৈফিয়ত আল্লাহর কাছে দিতে হবে। সেদিন

এক অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও তা দেখা হবে এবং এক অণু পরিমাণ অন্যায় করলেও তা দেখা হবে (যিলযাল ৭-৮)।

৩য় ভিত্তি হল : পরামর্শ করা। এজন্য নির্ধারিত ব্যক্তিগণ ছাড়াও সমাজের অন্যান্য জ্ঞানী-গুণীদের নিকট থেকেও পরামর্শ নিতে হবে। এজন্য বলা হয়ে থাকে, 'জ্ঞানের কথা জ্ঞানীর জন্য কুড়ানো মানিক সদৃশ'। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'তুমি তাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ কর। অতঃপর যখন সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর' (আলে ইমরান ১৫৯)।

৪র্থ ভিত্তি হল : রাজকোষ সমৃদ্ধ হওয়া। এজন্য দু'টি পথ রয়েছে। এক- হারাম আয়ের উৎস সমূহ বন্ধ করা এবং দুই- হালাল আয়ের উৎস সমূহ খুলে দেওয়া। এজন্য শর্ত হল দেশে ঈমান ও তাক্বওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা (আ'রাফ ৯৬)। তাহ'লে কেবল সরকারী রাজকোষ নয়, জনগণের মধ্যে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি নিশ্চিত হবে। সরকারী প্রশাসন ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলি দুর্নীতিমুক্ত হ'লে বাকী সেক্টরগুলি আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ইয়াছরিবে হিজরত করে এলেন, তখন মাপ ও ওযনে কম দেওয়ার জন্য তারা প্রসিদ্ধ ছিল। অতঃপর যখন তারা মুসলমান হল এবং সূরা মুত্বাফফেফীন নাযিল হল, তখন মদীনাবাসীরা এই পাপ থেকে মুক্ত হল। মদ হারামের আয়াত নাযিল হ'লে তারা নিজেরা মদের ভান্ড গুলি রাস্তায় ঢেলে দিল ও মদ থেকে চিরতরে তওবা করল। ইসলাম আসার পর আরব জাতির মধ্যে সে সময়ে প্রচলিত ৩০-এর অধিক ব্যবসাকে হারাম করা হল, যা অত্যাচার মূলক ছিল। বর্তমান যুগের ভ্যাটসহ নানা ধরনের অত্যাচার মূলক আয়ের উৎস ও সূদী অর্থনীতি বন্ধ করা গেলে এবং যাকাত ও ইসলামী অর্থনীতি পূর্ণভাবে অনুসরণ করা গেলে, সাথে সাথে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা বাদ দিয়ে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা চালু হ'লে দেশ অতি দ্রুত সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ।

বাংলাদেশ সর্বদা সমৃদ্ধ দেশ। বিগত দিনে বিদেশীরা সর্বদা এদিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে এবং আজও তাকিয়ে আছে। তাই তাদের মাধ্যমে দেশে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের চাইতে বড় প্রয়োজন হল ভূগর্ভের ও ভূপৃষ্ঠের পানি দূষণমুক্ত করা এবং ঢাকা সহ দেশের নগরীগুলিকে বায়ু দূষণ হ'তে রক্ষা করা। নইলে দূষিত পানি ও দূষিত বায়ু সেবনে সত্ত্বর মানবতার ধ্বংস নেমে আসবে। অতএব বিদেশ নির্ভর না

হয়ে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয়ে একনিষ্ঠভাবে দেশের ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠের সম্পদ সমূহ কাজে লাগানোর মধ্যেই আল্লাহর রহমত অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ বলেন, 'জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের দরুণ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম' (আ'রাফ ৯৬)। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

মানুষের সৃষ্ট আইন দ্বারা কি সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়?

ন্যায় বিচার' কথাটা পুরোপুরি আপেক্ষিক। আপনার কাছে যেটা অন্যায় বিচার আমার কাছে সেটা ন্যায় বিচার হতে পারে। এখন ধরা যাক পৃথিবীর কোন কোন দেশের প্রতিটা মানুষ মনে করে যে তাদের দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ধরা যাক এগুলোর মধ্যে সৌদি আরব, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, আইসল্যান্ড আর বাংলাদেশ আছে। সৌদি আরবের বিষয়ে বলতে পারি না, তবে বাকি দেশগুলোসহ পৃথিবীর আর কোন দেশে পুরোপুরিভাবে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্ট আইন চালূ আছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না, যদিও সেটা হতে পারে । এটা অবশ্যই- আইন বলবৎ থাকা আর আইনের প্রেয়োগ বলবৎ থাক একই অর্থ প্রকাশ করে না।

আমি এ কথা বলতে বাধ্য যে, আমাদের অনেকের হিসাবে মহানবী (স) এর আর খোলাফায়ে রাশেদিনের সময়কালে যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল তার কাছাকাছি ন্যায় বিচার পৃথিবীর আর কোথাও কখনো হয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না। তখন সৃষ্টিকর্তা সৃষ্ট আইন দ্বারা বিচার হতো।

আমার বিবেচনামতে বলতে পারি, মনুষ্য সৃষ্ট আইনের দ্বারা সামাজের বা রাষ্ট্রের ন্যায়বিচার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি ।
মনুষ্য সৃষ্ট আইন দ্বারা কি সমাজে বা রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে?
অবশ্যই সম্ভব নয়। মানুষ পরিবর্তনশীল, স্বভাবগত তার আইনও পরিবর্তন শীল। মানুষ তার নিজের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করে, স্বার্থে আঘাত লাগলেই আইন রহিত করে এটাই তার স্বভাব। একমাত্র সৃষ্টি কর্তাই জানে তার সৃষ্ট জীবের স্বভাব, প্রকৃতি আর আকাঙ্খা।

তিনি সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যানেন তাই, কি সমস্যা সৃষ্টি হবে তাও জানেন আর তার সমাধানও দিয়ে দিয়েছেন।

আমরা একটা প্রবাদ জানি "মাইট ইজ রাইট" জোর যার মুল্লুক তার। মনুষ্য সৃষ্ট আইন এটাই বাস্তবায়ন করে। আমেরিকার দিকে তাকান, সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, ভিয়েতনামে হাজার হাজার নিরীহ জনতাকে মারল শান্তি মিশন নামে বৈধ পাশ নিয়ে। আসলেই কী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? গণতন্ত্রের মুখোশে চলছে পীড়ননীতি।

আমেরিকার ফাউন্ডার ফাদারস রা এমন আমেরিকার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন না। তারা চেয়েছিলেন শান্তির এক বিশ্ব, এক ভ্রাতৃত্বময় বিশ্ব। কিন্তু কালের করুণ দশায় আজ কি পরিণতি তার আইনের। তার আইন প্রণেতাদের।

সমকামীতার কথাই ধরি, ইতিহাসের চরম নিকৃষ্টতম পাপাচার, যে পাপাচারে ধ্বংশ করে দেয়া হয়েছিল লূত (আঃ) এর সম্প্রদায়কে। উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিল লোহিত সাগরে যেটা নাকি আজ ডেড সী বলে পরিচিত। সীমালংঘনের কারণে এমন অনেক সম্প্রদায় ধ্বংশ হয়ে গেছে, দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আধুনিক ইতালীর কথাই ধরুন। সীমালংঘনের এমন সীমায় এসে পৌছেছিল, পম্পেই নগরীকে লাভার নীচে ভষ্মীভূত করে দেয়া হল। যখন পম্পেই নগরী নতুন করে আবিষ্কার করা হয়, সেটা এডাল্ট জোনে চিহ্নিত হয় এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের গমন সেখানে নিষেধ ছিল। সেখান কার পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে যেভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল সেভাবেই মমি হয়ে ভষ্মের নীচে যুগ যুগ ধরে পড়ে ছিল।

গৌতমবুদ্ধ যখন দিব্যজ্ঞাব লাভ করে করে তখন অন্যতম প্রচার ছিল, অহিংসা পরম ধর্ম আর জীবহত্যা মহা পাপ। এখন মায়ানমার, চীন আর রাশিয়ার দিকেই তাকান। প্রকাশ্যে কিভাবে মানুষকে বৈধ সনদ নিয়ে হত্যা করছে। মানব সৃষ্ট আইনেরই ফল এটা। গৌতম বুদ্ধের মূলনীতির সাথে যায় কি বৌদ্ধ বোদ্ধাদের এ আধুনিক আইন, তারা আইন তৈরী করে তাদের নিজ প্রয়োজনে। যখন সে আইন থেকে ফল পায় তখন তা চলে, যখন ফল পায় না তখন রহিত করে।

হিন্দু বা মুসলিম কোন ধর্মের বইতে উল্লেখ আছে দাঙ্গা বাধাতে হবে? অথচ আমরা গুজরাটের দাঙ্গা দেখেছি, দিল্লীর গণহত্যা দেখলাম, ১৯৭১ এর যুদ্ধ দেখেছি। মানব সৃষ্ট আইনের ফল এর চেয়ে আর কি হতে পারে। সৃষ্টিকর্তা কী বলে জানেন ? "বিশৃঙ্খলা হত্যা অপেক্ষা জঘন্য কাজ। আর যে নিরপরাধ কাউকে হত্যা করল, সে যেন পুরো মানব জাতিকে হত্যা করল।"

আইনের কোন ধারায় আছে সদা সত্য কথা বলতে হবে, বড়দের সম্মান করতে হবে, ছোটদের স্নেহ করতে হবে? আরো নানান মানবিক বিষয় মানব আইনে সুস্পষ্ট নয়।

তাই আবার বলি মানব সৃষ্ট আইন মানুষের জন্যই তৈরী, তার স্বার্থই দেখবে (বিশেষ করে নির্দিষ্ট এক শ্রেণীর স্বার্থ) যার ফলাফল আপনি আমি সবাই দেখছি। এজন্যই হয়ত কোন সময় সক্রেটিস বলেছিলেন "আইন নিম্ন সম্প্রদায়ের জন্য মাকড়সার জালের ন্যায়, আর উচ্চ শ্রেণীর জন্য প্রসারিত উদ্যান" । এই মানব সৃষ্ট আইনেই হত্যা করা হয় নির্দোষ, নির্লোভ জাতির শ্রেষ্ঠ এ সন্তানকে। এমন হাজারো শ্রেষ্ঠ সন্তানকে প্রাণ দিতে হয়েছে এই মানব সৃষ্ট আইনের গ্যাড়াকলে ফেসে।

এমন আচরণের কিছু উদাহরণ আছে যা সমাজের জন্য মানুষকে শাস্তি দেবে, এমনকি যদি আইনটি আইনের মধ্যে থাকে?
সামরিক আইন ও সেনা আইন কি একই জিনিস?
সমাজের বিচার-ব্যবস্থা সঠিক না থাকলে কী করা যায়?
সমাজ মানস থেকে ন্যায়বোধকে, যেন ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চাইছে, আইন-শৃঙ্খলা ও বিচার-বিভাগের হর্তাকর্তা বিধাতারা। রংবেরং এর প্রভাবশালীদের অপকর্মের প্রমাণগুলি তারাই ক্ষমতা-যুক্তি দিয়ে ধুয়েমুছে-চকচক-সাফ-সাদা করে অপরাধীদের মুক্ত করে দিচ্ছে। আপনার মতামত কী?
মানুষ আইন কেন মেনে চলে?
মনুষ্য সৃষ্ট আইনের বিপরীতে সম্ভবত সৃষ্টিকর্তা সৃষ্ট আইন বোঝাতে চেয়েছেন।

‘ন্যায় বিচার’ কথাটা পুরোপুরি আপেক্ষিক। আপনার কাছে যেটা অন্যায় বিচার আমার কাছে সেটা ন্যায় বিচার হতে পারে। এখন ধরা যাক পৃথিবীর কোন কোন দেশের প্রতিটা মানুষ

মনে করে যে তাদের দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ধরা যাক এগুলোর মধ্যে সৌদি আরব, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, আইসল্যান্ড আর বাংলাদেশ আছে। সৌদি আরবের বিষয়ে বলতে পারি না, তবে বাকি দেশগুলোসহ পৃথিবীর আর কোন দেশে পুরোপুরিভাবে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্ট আইন চালু আছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না, যদিও সেটা হতে পারে । এটা অবশ্যই-আইন বলবৎ থাকা আর আইনের প্রেয়োগ বলবৎ থাক একই অর্থ প্রকাশ করে না।

আমি এ কথা বলতে বাধ্য যে, আমাদের অনেকের হিসাবে মহানবী (স) এর আর খোলাফায়ে রাশেদিনের সময়কালে যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল তার কাছাকাছি ন্যায় বিচার পৃথিবীর আর কোথাও কখনো হয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না। তখন সৃষ্টিকর্তা সৃষ্ট আইন দ্বারা বিচার হতো।

আমার বিবেচনামতে বলতে পারি, মনুষ্য সৃষ্ট আইনের দ্বারা সামাজের বা রাষ্ট্রের ন্যায়বিচার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি ।

মানুষের সৃষ্টি আইন দিয়ে মানুষকে পরিচালনা করা মানুষের জন্যেই অবমাননাকর। কেননা, আইনের কাছে আপনাকে আত্মসমর্পন করতে হবে। মানুষের জন্যে এটা শোভন নয় যে সে স্রষ্টা ছাড়া আর কারো কাছে আত্মসমর্পন করবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে কিং ডেভিড আলাইহি ওয়া সাল্লাম,কিং সলোমন আলাইহি ওয়া সাল্লাম, জুলকারনাইন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খলিফায়ে রশিদুন আল্লাহর আইনে রাজ্য শাসন করেছেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা নিদর্শন স্থাপন করেছেন।

মানুষের তৈরী আইনের কোন আদর্শ রূপ নেই। কাজেই কোন কোন সমাজে আপনি নেংটা হয়ে জনসমক্ষে ঘুরবেন আইন আপনাকে শাস্তি দেবে না। পুরুষ পুরুষের সাথে, নারী নারীর সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করবে, আইন আপনাকে শাস্তি দেবে না।

তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ আছে, নাম বললে চাকরি থাকবে না, যেখানে সংবিধান হল ছোট বাচ্চাদের লেখার শ্লেটের মত। যা ইচ্ছা লেখা যায়, যা খুশি মুছে ফেলা যায়। মানুষের বানানো সংবিধান এমন এক জিনিস।

আপনি সমাজে কখনো প্রোপার জাস্টিজ পাবেন না। এটা বাংলাদেশের সমাজ বলুন আর আমেরিকা কিংবা সৌদির সমাজ বলুন। তার থেকেও বড় বিষয় আমরা কখনো আইনের প্রোপার ইউটিলাইজেশন করতে পারি না। এটা পৃথিবীর যেকোন সমাজের কথা বলুন না কেনো।

আসলে আমরা মানুষ অনেক বেশি পক্ষপাত করি। আমরা আবেগ আমাদের ইমোশনস যাবতীয় জিনিস গুলার কারনে আমাদের সৃষ্ট আইন তে বর্তমান সময়ে আমার মতে ন্যায় বিচার পাওয়া টা খুব বেশি কম্প্লিকেটেড হয়ে গিয়েছে।

তবে একসময় ছিল যখন ন্যায় বিচার পাওয়া যেত। আমাদের ইসলামে খলিফাদের টাইম পিরিয়ড টা তে। এখন আপনি বলতো পারেন খলিফা রা তো মানুষ ছিল এবং তাদের আইন তো ন্যায় বিচার পাবার জন্য যথেষ্ট ছিল। তবে আমি বলবো হ্যা সে সময় ছিল।

খলিফা রা তাদের বেশিরভাগ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করত ইসলামিক হাদিস ও কুরআন অনুসারে। যে আইন মহাশক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা থেকে প্রদত্ত তা আর যাই হোক নির্ভুল ছিল। ছিল নিরপেক্ষ।

মতামত টি সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব।
ধরুন যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে তারা চাইছে সমকামীতার বৈধতা দিতে। কিন্তু বিরোধী দল চাইছে সমকামীতা অবৈধ ঘোষণা করতে। এখন রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন দল যখন সংসদে সমকামী আইনের বৈধতা দিবে তখন অপর দল বিক্ষুব্ধ হবে। তারা এই আইনের বিরোধিতা করে অপরপক্ষের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। আবার ধরুন একপক্ষ চাচ্ছে রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু অপর এক পক্ষ চাচ্ছে রাষ্ট্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করতে। এখন যখন একপক্ষ সমাজতন্ত্র কায়েম করতে যাবে তখন অপর পক্ষ এঠির বিরোধিতা করে রক্তারক্তি করবে। আসল কথা হলো মনুষ্য সৃষ্ট আইন কখনও নিরপেক্ষ হবে না। যে যার মতো করে সমাজে আইন প্রতিষ্ঠা করতে যাবে। আর এতে রাষ্ট্রে হানাহানি শুরু হবে।

আমাদের দেশের একটা উদাহরণ দেইঃ পরিবহন শ্রমিকরা চাচ্ছে তাদের শাস্তি আরও কমাতে। অপরদিকে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের বিক্ষুব্ধ জনতা চাচ্ছে পরিবহন আইন আরও কড়া করতে। এখন সবাই যদি নিজ নিজ সুবিধা মতো আইন তৈরী করে তাহলে রাষ্ট্রের কি অবস্থা হবে? রাষ্ট্র পুরোপুরি অচল হয়ে যাবে। একদল অপর দলকে আক্রমণ করবে। রাষ্ট্রে ব্যাপক প্রানহানী ঘটবে।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে মনুষ্য সৃষ্ট আইন দ্বারা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত আইন দ্বারা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার কল্যাণকামীতা:

বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণে ইসলাম সর্বজনস্বীকৃত আল্লাহ মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। সেকারণ ইসলাম শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ধর্ম। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ সর্বশেষ ওহী আল-কুরআনে সকল সমস্যার সমাধান বর্ণিত হয়েছে। সমাজে শান্তি ও কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র ও সরকারের অন্যতম বিভাগ হচ্ছে বিচার বিভাগ। যে সমাজে জনগণের ফরিয়াদ শুনে তার প্রতিকারের জন্য সঠিক বিচার ব্যবস্থা নেই, সে সমাজ কখনই মানুষের বসবাসোপযোগী সমাজ হ'তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন আল্লাহর মনোনীত রাসূল ও কাযী বা বিচারক। বিচারক হিসাবে তিনি পৃথিবীতে যে ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তার কল্যাণকামিতা সার্বজনীন।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে যে বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠে তাই ইসলামী বিচার ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের প্রধানতঃ তিনটি বিভাগ থাকে। (ক) আইন বিভাগ (খ) নির্বাহী বা শাসন বিভাগ ও (গ) বিচার বিভাগ। সাধারণ বিচার ব্যবস্থায় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আইন প্রণয়ন করে থাকেন। পক্ষান্তরে ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় এর কোন সুযোগ নেই। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় আইনের উৎস মূলতঃ তিনটি। (১) পবিত্র আল-কুরআন (২) ছহীহ হাদীছ ও (৩) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইজতিহাদ বা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ-

‘নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেছি কিতাব ও মীযান। যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে না দেখে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী’ (হাদীদ ৫৭/২৫)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ,

‘হুকুম দেওয়ার মালিক স্রেফ আল্লাহ। তিনি (তাঁর রাসূলের নিকট) সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়ছালাকারী’ (আন‘আম ৬/৫৭)।

বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণে ইসলাম সর্বজনস্বীকৃত আল্লাহ মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। সেকারণ ইসলাম শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ধর্ম। অপরদিকে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হ’তে অবতীর্ণ সর্বশেষ ওহী আল-কুরআনে সকল সমস্যার সমাধান বর্ণিত হয়েছে। সমাজে শান্তি ও কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র ও সরকারের অন্যতম বিভাগ হচ্ছে বিচার বিভাগ। যে সমাজে জনগণের ফরিয়াদ শুনে তার প্রতিকারের জন্য সঠিক বিচার ব্যবস্থা নেই, সে সমাজ কখনই মানুষের বসবাসোপযোগী সমাজ হ’তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন আল্লাহর মনোনীত রাসূল ও কাযী বা বিচারক। বিচারক হিসাবে তিনি পৃথিবীতে যে ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তার কল্যাণকামিতা সার্বজনীন।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে যে বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠে তাই ইসলামী বিচার ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের প্রধানতঃ তিনটি বিভাগ থাকে। (ক) আইন বিভাগ (খ) নির্বাহী বা শাসন বিভাগ ও (গ) বিচার বিভাগ। সাধারণ বিচার ব্যবস্থায় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আইন প্রণয়ন করে থাকেন। পক্ষান্তরে ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় এর কোন সুযোগ নেই। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় আইনের উৎস মূলতঃ তিনটি।

(১) পবিত্র আল-কুরআন (২) ছহীহ হাদীছ ও (৩) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইজতিহাদ বা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ-

‘নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেছি কিতাব ও মীযান। যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে না দেখে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী’ (হাদীদ ৫৭/২৫)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ,

‘হুকুম দেওয়ার মালিক স্রেফ আল্লাহ। তিনি (তাঁর রাসূলের নিকট) সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়ছালাকারী’ (আন‘আম ৬/৫৭)।

আল্লাহ আরও বলেন

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا,''

''‘নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি'' সত্যসহকারে। যাতে তুমি সে অনুযায়ী লোকদের মধ্যে ফায়ছালা করতে পার, যা আল্লাহ তোমাকে জানিয়েছেন। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষে বাদী হয়ো না’ (নিসা ৪/১০৫)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরও বলন,وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ‘আর যদি বিচার কর, তবে ইনছাফপূর্ণ বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন’ (মায়েদাহ ৪২)।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার মূলনীতি : ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিচার ব্যবস্থা পৃথিবীতে বিদ্যমান। শরী‘আতে যেকোন বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর সিদ্ধান্তকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা ইসলামী

বিচার ব্যবস্থার মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। যা নিম্নের দায়িত্বগুলো পালন করে থাকে।

১. সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করা।

২. সমাজের সকল প্রকার ক্ষতিকর বিষয়গুলো প্রতিহত করা।

৩. সরকার ও জনগণের মধ্যে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করা ইত্যাদি।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণে সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে স্থায়ী ও স্থিতিশীল সমাজ গঠনের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা সাধন এবং শান্তি, স্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা বিধানকল্পে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

সমাজে বসবাসরত জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত মীমাংসার জন্য বিচারকার্য পরিচালনা করা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা এ কাজটি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করার উপরই নির্ভর করে মানুষের মাঝে পারস্পরিক মিলমিশ, আন্তরিকতা, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বজায় রেখে সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখা। ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের সকল প্রকার অধিকার, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়। সেকারণ এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

১. মানব সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে ইনছাফ বা ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

২. ইনসানিয়াত বা মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে স্থায়ী ও স্থিতিশীল সমাজ গঠন করা।

৩. সমাজে বিরাজিত সকল প্রকার যুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচারের আগ্রাসন রোধ করা।

৪. জীবন ও স্বাধীনতার পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করা।

৫. জীবন ও সম্মানের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা

৬. নাশকতামূলক সকল প্রকার কর্মকান্ডের সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন করা।

৭. সর্বোপরি সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার, অশ্লীলতার মূলে কুঠারাঘাত করা।

ইনছাফ বা ন্যায়বিচার মুসলমানদের কাছে ঈমান আনয়নের পর অবশ্য পালনীয় ফরয সমূহের মধ্যে একটি ফরয কাজ। কেননা আসমান ও যমীন ন্যায়বিচারের মাধ্যমে টিকে আছে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজেকে একজন ন্যায়বিচারক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাঁর নবীকে সুবিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ,

আর আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তাদের মধ্যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করবে এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। আর তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো যেন তারা তোমাকে আল্লাহ প্রেরিত কিছু বিধানের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে না ফেলে' (মায়েদাহ ৫/৪৯)।

কোন জাতির শ্রেষ্ঠ কীর্তিমালার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তার ভিত্তি ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তা'আলা হযরত দাঊদ (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ-

'হে দাঊদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে শাসক নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়বিচার কর। এ বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। তাহ'লে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এ কারণে যে, তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে' (ছাদ ৩৮/২৬)।

বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণে ইসলাম সর্বজনস্বীকৃত আল্লাহ মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। সেকারণ ইসলাম শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ধর্ম। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ সর্বশেষ ওহী আল-কুরআনে সকল সমস্যার সমাধান বর্ণিত হয়েছে। সমাজে শান্তি ও কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র ও সরকারের অন্যতম বিভাগ হচ্ছে

বিচার বিভাগ। যে সমাজে জনগণের ফরিয়াদ শুনে তার প্রতিকারের জন্য সঠিক বিচার ব্যবস্থা নেই, সে সমাজ কখনই মানুষের বসবাসোপযোগী সমাজ হ’তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন আল্লাহর মনোনীত রাসূল ও কাযী বা বিচারক। বিচারক হিসাবে তিনি পৃথিবীতে যে ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তার কল্যাণকামিতা সার্বজনীন।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে যে বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠে তাই ইসলামী বিচার ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের প্রধানতঃ তিনটি বিভাগ থাকে। (ক) আইন বিভাগ (খ) নির্বাহী বা শাসন বিভাগ ও (গ) বিচার বিভাগ। সাধারণ বিচার ব্যবস্থায় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আইন প্রণয়ন করে থাকেন। পক্ষান্তরে ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় এর কোন সুযোগ নেই। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় আইনের উৎস মূলতঃ তিনটি। (১) পবিত্র আল-কুরআন (২) ছহীহ হাদীছ ও (৩) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইজতিহাদ বা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ-

‘নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেছি কিতাব ও মীযান। যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে না দেখে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী’ (হাদীদ ৫৭/২৫)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ,

‘হুকুম দেওয়ার মালিক স্রেফ আল্লাহ। তিনি (তাঁর রাসূলের নিকট) সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়ছালাকারী’ (আন‘আম ৬/৫৭)।

আল্লাহ আরও বলেন

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا,

'নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সত্যসহকারে। যাতে তুমি সে অনুযায়ী লোকদের মধ্যে ফায়ছালা করতে পার, যা আল্লাহ তোমাকে জানিয়েছেন। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষে বাদী হয়ো না' (নিসা ৪/১০৫)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরও বলন,

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

'আর যদি বিচার কর, তবে ইনছাফপূর্ণ বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন' (মায়েদাহ ৪২)।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার মূলনীতি : ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিচার ব্যবস্থা পৃথিবীতে বিদ্যমান। শরী'আতে যেকোন বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর সিদ্ধান্তকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা ইসলামী বিচার ব্যবস্থার মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। যা নিম্নের দায়িত্বগুলো পালন করে থাকে।

১. সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করা।

২. সমাজের সকল প্রকার ক্ষতিকর বিষয়গুলো প্রতিহত করা।

৩. সরকার ও জনগণের মধ্যে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করা ইত্যাদি।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণে সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে স্থায়ী ও স্থিতিশীল সমাজ গঠনের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা সাধন এবং শান্তি, স্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা বিধানকল্পে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : সমাজে বসবাসরত জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত মীমাংসার জন্য বিচারকার্য পরিচালনা করা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা এ কাজটি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করার

উপরই নির্ভর করে মানুষের মাঝে পারস্পরিক মিলমিশ, আন্তরিকতা, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বজায় রেখে সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখা। ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের সকল প্রকার অধিকার, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়। সেকারণ এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মানুষের শুধু বিচার নয়, প্রয়োজন সুবিচারের। আর ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল এটা সম্ভব। সেজন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন।

১. মানব সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে ইনছাফ বা ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

২. ইনসানিয়াত বা মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে স্থায়ী ও স্থিতিশীল সমাজ গঠন করা।

৩. সমাজে বিরাজিত সকল প্রকার যুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচারের আগ্রাসন রোধ করা।

৪. জীবন ও স্বাধীনতার পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করা।

৫. জীবন ও সম্মানের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৬. নাশকতামূলক সকল প্রকার কর্মকান্ডের সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন করা।

৭. সর্বোপরি সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার, অশ্লীলতার মূলে কুঠারাঘাত করা।

ইনছাফ বা ন্যায়বিচার মুসলমানদের কাছে ঈমান আনয়নের পর অবশ্য পালনীয় ফরয সমূহের মধ্যে একটি ফরয কাজ। কেননা আসমান ও যমীন ন্যায়বিচারের মাধ্যমে টিকে আছে। স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা নিজেকে একজন ন্যায়বিচারক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাঁর নবীকে সুবিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ,

আর আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তাদের মধ্যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করবে এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। আর তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো যেন তারা তোমাকে আল্লাহ প্রেরিত কিছু বিধানের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে না ফেলে' (মায়েদাহ ৫/৪৯)।

কোন জাতির শ্রেষ্ঠ কীর্তিমালার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তার ভিত্তি ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তা'আলা হযরত দাঊদ (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন
يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ,

'হে দাঊদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে শাসক নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়বিচার কর। এ বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। তাহ'লে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এ কারণে যে, তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে' (ছাদ ৩৮/২৬)।

ইসলামে বিচারকের দায়িত্ব ও কর্তব্য : ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী ও কর্মনীতি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-

১. রাগান্বিত অবস্থায় বিচার না করা : চিকিৎসা বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ক্রোধের সময় রক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ফলে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায় এবং সে তখন ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করতে পারে না। এজন্য ইসলামী শরী'আতে রাগান্বিত অবস্থায় বিচার-ফায়ছালা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আব্দুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে,كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ، وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ، بِأَنْ لاَ تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ-
'আবু বাকরাহ সিজিস্তানে অবস্থানকারী তার পুত্রকে লিখে পাঠান যে, তুমি রাগান্বিত অবস্থায় লোকদের মাঝে বিচার-ফায়ছালা করবে না। কেননা আমি নবী করীম (ছাঃ)-

কে বলতে শুনেছি যে, কোন বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় দু’জনের মধ্যে বিচার-ফায়ছালা করবে না’।[1]

২. বাদী-বিবাদী উভয়ের কথা শ্রবণ করা : ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বাদী-বিবাদী উভয়ের কথা শ্রবণ করার পর বিচারক ফায়ছালা দিবেন। এক পক্ষের বক্তব্যের উপর নির্ভর করে রায় প্রদান করতে শরী‘আতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

-إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلاَنِ فَلاَ تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلاَمَ الآخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِى كَيْفَ تَقْضِى,

‘তোমার নিকট যখন দু’জন লোক বিচারের জন্য আবেদন করে, তখন তুমি দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে না শুনেই প্রথম পক্ষের কথার উপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করবে না। তুমি খুব শীঘ্রই জানতে পারবে, তুমি কিভাবে ফায়ছালা করেছ’।[2] তিনি আরো বলেন

إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ,

তোমার নিকট যখন দু’জন লোক বিচারের জন্য বসে, তখন তুমি তাদের মাঝে ফায়ছালা করবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য শুনবে যেভাবে তুমি প্রথম পক্ষের কথা শুনেছ। যখন তুমি এরূপ করবে, তখন তোমার কাছে ফায়ছালার বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে’।[3]

৩. বাদী-বিবাদী উভয়ের প্রতি বিচারকের সম আচরণ করা : ইসলামের দৃষ্টিতে বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষ বিচারকের নিকটে সম অবস্থানে থাকবে। বিচারক বসার ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে সমতা বিধান করবেন। উভয়ের দিকে সমভাবে দৃষ্টিপাত করবেন। কোন অবস্থাতেই এক পক্ষকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। এটা এজন্য করতে হবে, বাদী-বিবাদী কোন পক্ষই যেন এ ধারণা না করে যে, বিচারক কোন এক পক্ষের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। এমন অবস্থা হ’লে বিচারকের নিকট থেকে ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহের সৃষ্টি হবে।

অনুরূপভাবে বিচারক আল্লাহর বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিচার-ফায়ছালা করার সময় ধনী-গরীব, ছোট-বড়, দাস-মনিব, রাজা-প্রজা এবং উচ্চ বর্ণ-নিম্ন বর্ণের মধ্যে

কোন প্রকার পার্থক্য করতে পারবেন না। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন

إِنَّمَا النَّاسُ كَالإِبِلِ الْمِائَةُ لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً,

'নিশ্চয়ই মানুষ এমন একশত উটের মত, যাদের মধ্য থেকে তুমি একটিকেও বাহনের উপযোগী পাবে না'।[4]

এর অর্থ হ'ল ইসলামে সকল মানুষই সমান। যেমন একশত উটের মধ্যে সবগুলোর মর্যাদা সমান। তেমনি মানুষের মধ্যে ধনী-গরীব, সাদা-কালো, আশরাফ-আতরাফ সকলের মর্যাদা সমান।

৪. কোন পক্ষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ পূর্বক বিচার না করা : ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারক যেন কোন অবস্থাতেই কোন পক্ষের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে বিচার কার্য পরিচালনা না করে সে বিষয়ে আল-কুরআনে কঠোর হুঁশিয়ারী ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ,

'কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত' (মায়েদাহ ৫/৮)।

৫. ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে বিচার না করা : ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঘুষের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সতর্ক করা হয়েছে। কেননা ইসলামী শরী'আতে ঘুষ প্রথা আদান-প্রদান সম্পূর্ণরূপে হারাম। তা গ্রহণ করে অন্যায় বিচার করা যেমন হারাম, তেমনি ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে নিজের পক্ষে রায় বাগিয়ে নেওয়াও হারাম। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِى وَالْمُرْتَشِى فِى الْحُكْمِ,

'বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহীতা ও ঘুষ প্রদানকারীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অভিসম্পাত করেছেন'।[5]

৬. পদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ না করা : ইসলামে কোন দায়িত্ব বা পদ চেয়ে নেয়ার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। চাই তা প্রশাসনিক হোক বা বিচার বিভাগের হোক। যোগ্যতার মানদন্ডে যোগ্যতম ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অপর্ণের বিধান হ'ল ইসলামী বিধান। আল্লাহ বলেন

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ, اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيْرًا-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারগণের নিকটে পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সর্বোত্তম উপদেশ দান করছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' (নিসা ৪/৫৮)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুর রহমান বিন সামুরাহকে বললেন

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ,

হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ! নেতৃত্ব বা পদ চেয়ে নিয়ো না। কেননা তোমার চাওয়ার কারণে যদি তা দেয়া হয়, তাহ'লে তা তোমার উপর ন্যস্ত করা হবে। আর যদি তা তোমার চাওয়া ব্যতীত প্রদান করা হয়, তবে তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে'।

ন্যায়বিচার ব্যবস্থার সাক্ষাদান:

বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। সাক্ষ্যের মাধ্যমে একদিকে যেমন বাদীর দাবী প্রমাণিত হ'তে পারে, অপরদিকে তেমনি সেটা বিবাদীর পক্ষে বা বাদীর দাবী অসত্যও প্রমাণিত হ'তে পারে। এজন্য বাদী ও বিবাদী বিচারকার্যে নিজ নিজ পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকে। কেননা বিচারের কাজটি সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের উপরেই নির্ভরশীল। সাক্ষীর সত্য সাক্ষ্যের মাধ্যমে বিচারকার্য সঠিক হয়, মিথ্যা সাক্ষ্যের দরুন আবার অন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামে এ ব্যাপারটির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কুরআন মজীদে এ বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহ ঘোষণা করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হৌক বা গরীব হৌক (সেদিকে ভ্রুক্ষেপ কর না)। কেননা তোমাদের চাইতে আল্লাহ তাদের অধিক শুভাকাংখী। অতএব ন্যায়বিচারে প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ। আল্লাহ তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে অবহিত' (নিসা ৪/১৩৫)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ,

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে' (মায়েদাহ ৫/৮)।

বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণে ইসলাম সর্বজনস্বীকৃত আল্লাহ মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। সেকারণ ইসলাম শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ধর্ম। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ সর্বশেষ ওহী আল-কুরআনে সকল সমস্যার সমাধান বর্ণিত হয়েছে। সমাজে শান্তি ও কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র ও সরকারের অন্যতম বিভাগ হচ্ছে বিচার বিভাগ। যে সমাজে জনগণের ফরিয়াদ শুনে তার প্রতিকারের জন্য সঠিক বিচার ব্যবস্থা নেই, সে সমাজ কখনই মানুষের বসবাসোপযোগী সমাজ হ'তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন আল্লাহর মনোনীত রাসূল ও কাযী বা বিচারক। বিচারক হিসাবে তিনি পৃথিবীতে যে ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তার কল্যাণকামিতা সার্বজনীন।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে যে বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠে তাই ইসলামী বিচার ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের প্রধানতঃ তিনটি বিভাগ থাকে। (ক) আইন বিভাগ (খ) নির্বাহী বা শাসন বিভাগ ও (গ) বিচার বিভাগ। সাধারণ বিচার ব্যবস্থায় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আইন প্রণয়ন করে থাকেন। পক্ষান্তরে ইসলামী বিচার

ব্যবস্থায় এর কোন সুযোগ নেই। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় আইনের উৎস মূলতঃ তিনটি। (১) পবিত্র আল-কুরআন (২) ছহীহ হাদীছ ও (৩) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইজতিহাদ বা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ-

‘নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেছি কিতাব ও মীযান। যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে না দেখে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী’ (হাদীদ ৫৭/২৫)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْن,

‘হুকুম দেওয়ার মালিক স্রেফ আল্লাহ। তিনি (তাঁর রাসূলের নিকট) সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়ছালাকারী’ (আন‘আম ৬/৫৭)।

আল্লাহ আরও বলেন

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا,

‘নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সত্যসহকারে। যাতে তুমি সে অনুযায়ী লোকদের মধ্যে ফায়ছালা করতে পার, যা আল্লাহ তোমাকে জানিয়েছেন। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষে বাদী হয়ো না’ (নিসা ৪/১০৫)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরও বলন

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ,

‘আর যদি বিচার কর, তবে ইনছাফপূর্ণ বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন’ (মায়েদাহ ৪২)।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার মূলনীতি : ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিচার ব্যবস্থা পৃথিবীতে বিদ্যমান। শরী‘আতে যেকোন বিষয়ে

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর সিদ্ধান্তকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা ইসলামী বিচার ব্যবস্থার মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। যা নিম্নের দায়িত্বগুলো পালন করে থাকে।

১. সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করা।

২. সমাজের সকল প্রকার ক্ষতিকর বিষয়গুলো প্রতিহত করা।

৩. সরকার ও জনগণের মধ্যে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করা ইত্যাদি।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণে সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে স্থায়ী ও স্থিতিশীল সমাজ গঠনের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা সাধন এবং শান্তি, স্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা বিধানকল্পে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : সমাজে বসবাসরত জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত মীমাংসার জন্য বিচারকার্য পরিচালনা করা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা এ কাজটি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করার উপরই নির্ভর করে মানুষের মাঝে পারস্পরিক মিলমিশ, আন্তরিকতা, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বজায় রেখে সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখা। ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের সকল প্রকার অধিকার, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়। সেকারণ এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মানুষের শুধু বিচার নয়, প্রয়োজন সুবিচারের। আর ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল এটা সম্ভব। সেজন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন।

১. মানব সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে ইনছাফ বা ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

২. ইনসানিয়াত বা মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে স্থায়ী ও স্থিতিশীল সমাজ গঠন করা।

৩. সমাজে বিরাজিত সকল প্রকার যুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচারের আগ্রাসন রোধ করা।

৪. জীবন ও স্বাধীনতার পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করা।

৫. জীবন ও সম্মানের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৬. নাশকতামূলক সকল প্রকার কর্মকান্ডের সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন করা।

৭. সর্বোপরি সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার, অশ্লীলতার মূলে কুঠারাঘাত করা।

ইনছাফ বা ন্যায়বিচার মুসলমানদের কাছে ঈমান আনয়নের পর অবশ্য পালনীয় ফরয সমূহের মধ্যে একটি ফরয কাজ। কেননা আসমান ও যমীন ন্যায়বিচারের মাধ্যমে টিকে আছে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজেকে একজন ন্যায়বিচারক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাঁর নবীকে সুবিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন,

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ، '

আর আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তাদের মধ্যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করবে এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। আর তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো যেন তারা তোমাকে আল্লাহ প্রেরিত কিছু বিধানের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে না ফেলে' (মায়েদাহ ৫/৪৯)।

কোন জাতির শ্রেষ্ঠ কীর্তিমালার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তার ভিত্তি ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তা'আলা হযরত দাঊদ (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ,

'হে দাঊদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে শাসক নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়বিচার কর। এ বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। তাহ'লে তা তোমাকে

আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এ কারণে যে, তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে' (ছাদ ৩৮/২৬)।

ইসলামে বিচারকের দায়িত্ব ও কর্তব্য : ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী ও কর্মনীতি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-

১. রাগান্বিত অবস্থায় বিচার না করা : চিকিৎসা বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ক্রোধের সময় রক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ফলে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায় এবং সে তখন ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করতে পারে না। এজন্য ইসলামী শরী'আতে রাগান্বিত অবস্থায় বিচার-ফায়ছালা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আব্দুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে
كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ، وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ، بِأَنْ لاَ تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي,

'আবু বাকরাহ সিজিস্তানে অবস্থানকারী তার পুত্রকে লিখে পাঠান যে, তুমি রাগান্বিত অবস্থায় লোকদের মাঝে বিচার-ফায়ছালা করবে না। কেননা আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার-ফায়ছালা করবে না'।[1]

২. বাদী-বিবাদী উভয়ের কথা শ্রবণ করা : ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বাদী-বিবাদী উভয়ের কথা শ্রবণ করার পর বিচারক ফায়ছালা দিবেন। এক পক্ষের বক্তব্যের উপর নির্ভর করে রায় প্রদান করতে শরী'আতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلاَنِ فَلاَ تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلاَمَ الآخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِى كَيْفَ تَقْضِى-
'তোমার নিকট যখন দু'জন লোক বিচারের জন্য আবেদন করে, তখন তুমি দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে না শুনেই প্রথম পক্ষের কথার উপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করবে না। তুমি খুব শীঘ্রই জানতে পারবে, তুমি কিভাবে ফায়ছালা করেছ'।[2] তিনি আরো বলেন
إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ,

‘তোমার নিকট যখন দু’জন লোক বিচারের জন্য বসে, তখন তুমি তাদের মাঝে ফায়ছালা করবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য শুনবে যেভাবে তুমি প্রথম পক্ষের কথা শুনেছ। যখন তুমি এরূপ করবে, তখন তোমার কাছে ফায়ছালার বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে’।[3]

৩. বাদী-বিবাদী উভয়ের প্রতি বিচারকের সম আচরণ করা : ইসলামের দৃষ্টিতে বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষ বিচারকের নিকটে সম অবস্থানে থাকবে। বিচারক বসার ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে সমতা বিধান করবেন। উভয়ের দিকে সমভাবে দৃষ্টিপাত করবেন। কোন অবস্থাতেই এক পক্ষকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। এটা এজন্য করতে হবে, বাদী-বিবাদী কোন পক্ষই যেন এ ধারণা না করে যে, বিচারক কোন এক পক্ষের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। এমন অবস্থা হ’লে বিচারকের নিকট থেকে ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহের সৃষ্টি হবে।

অনুরূপভাবে বিচারক আল্লাহর বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিচার-ফায়ছালা করার সময় ধনী-গরীব, ছোট-বড়, দাস-মনিব, রাজা-প্রজা এবং উচ্চ বর্ণ-নিম্ন বর্ণের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করতে পারবেন না। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন

إِنَّمَا النَّاسُ كَالإِبِلِ الْمِائَةُ لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً،

‘নিশ্চয়ই মানুষ এমন একশত উটের মত, যাদের মধ্য থেকে তুমি একটিকেও বাহনের উপযোগী পাবে না’।[4]

এর অর্থ হ’ল ইসলামে সকল মানুষই সমান। যেমন একশত উটের মধ্যে সবগুলোর মর্যাদা সমান। তেমনি মানুষের মধ্যে ধনী-গরীব, সাদা-কালো, আশরাফ-আতরাফ সকলের মর্যাদা সমান।

৪. কোন পক্ষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ পূর্বক বিচার না করা : ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারক যেন কোন অবস্থাতেই কোন পক্ষের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে বিচার কার্য পরিচালনা না করে সে বিষয়ে আল-কুরআনে কঠোর হুঁশিয়ারী ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ,

কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত' (মায়েদাহ ৫/৮)।

৫. ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে বিচার না করা : ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঘুষের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সতর্ক করা হয়েছে। কেননা ইসলামী শরী'আতে ঘুষ প্রথা আদান-প্রদান সম্পূর্ণরূপে হারাম। তা গ্রহণ করে অন্যায় বিচার করা যেমন হারাম, তেমনি ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে নিজের পক্ষে রায় বাগিয়ে নেওয়াও হারাম। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِى وَالْمُرْتَشِى فِى الْحُكْمِ,

'বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহীতা ও ঘুষ প্রদানকারীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অভিসম্পাত করেছেন'।[5]

৬. পদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ না করা : ইসলামে কোন দায়িত্ব বা পদ চেয়ে নেয়ার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। চাই তা প্রশাসনিক হোক বা বিচার বিভাগের হোক। যোগ্যতার মানদন্ডে যোগ্যতম ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অপর্ণের বিধান হ'ল ইসলামী বিধান। আল্লাহ বলেন

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ,
-اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيْرًا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারগণের নিকটে পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সর্বোত্তম উপদেশ দান করছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' (নিসা ৪/৫৮)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুর রহমান বিন সামুরাহকে বললেন

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ,

‘হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ! নেতৃত্ব বা পদ চেয়ে নিয়ো না। কেননা তোমার চাওয়ার কারণে যদি তা দেয়া হয়, তাহ’লে তা তোমার উপর ন্যস্ত করা হবে। আর যদি তা তোমার চাওয়া ব্যতীত প্রদান করা হয়, তবে তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে’।[6]

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষ্য দান : বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। সাক্ষ্যের মাধ্যমে একদিকে যেমন বাদীর দাবী প্রমাণিত হ’তে পারে, অপরদিকে তেমনি সেটা বিবাদীর পক্ষে বা বাদীর দাবী অসত্যও প্রমাণিত হ’তে পারে। এজন্য বাদী ও বিবাদী বিচারকার্যে নিজ নিজ পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকে। কেননা বিচারের কাজটি সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের উপরেই নির্ভরশীল। সাক্ষীর সত্য সাক্ষ্যের মাধ্যমে বিচারকার্য সঠিক হয়, মিথ্যা সাক্ষ্যের দরুন আবার অন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামে এ ব্যাপারটির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কুরআন মজীদে এ বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহ ঘোষণা করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

‘হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হৌক বা গরীব হৌক (সেদিকে ভ্রুক্ষেপ কর না)। কেননা তোমাদের চাইতে আল্লাহ তাদের অধিক শুভাকাংখী। অতএব ন্যায়বিচারে প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ। আল্লাহ তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে অবহিত’ (নিসা ৪/১৩৫)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ,

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে’ (মায়েদাহ ৫/৮)।

বর্ণিত আয়াতদ্বয়ে সাক্ষ্যদাতাকে আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণে ন্যায় বিচারের স্বার্থে সাক্ষ্যদাতাকে সত্য সাক্ষ্য দিতে হবে। এজন্য কুরআনের বক্তব্যের দৃষ্টিতে সাক্ষীদেরকে আল্লাহর সাক্ষী হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে; কোন বিশেষ পক্ষের সাক্ষী নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচারককে যেমন ন্যায়পন্থী হওয়া যরূরী; তেমনি সাক্ষীকেও ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِى يَأْتِى بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

'তোমাদের কি আমি উত্তম

সাক্ষীদের সম্পর্কে জানাব না? উত্তম সাক্ষী হ'ল সেই ব্যক্তি, যে সাক্ষ্য প্রদান করে তাকে সাক্ষ্যের জন্য আহবানের আগেই'।[7]

অপরদিকে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকে শরী'আতে কবীরাহ গুনাহ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ-

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে কবীরাহ গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া'।[8]

পবিত্র কুরআনে যারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান না করে তাদেরকে আল্লাহর খাঁটি বান্দা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

' وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

(আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ তারাই) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না' (ফুরক্বান ২৫/৭২)।

অনুরূপভাবে সাক্ষ্যদানে কোন কিছু গোপন করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন

' وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ,

আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন কর না। যে ব্যক্তি তা গোপন করে, তার হৃদয় পাপিষ্ঠ। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত' (বাক্বারাহ ২/২৮৩)।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, বিচার করা এবং শাস্তি প্রয়োগ করার মধ্যেই ইসলামী বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি নিহিত। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র ব্যতীত কোন ব্যক্তির জন্য কোন প্রকার শাস্তি কার্যকর করা বৈধ নয়। আর দ্রুত বিচার কার্যকর করা তো ইসলামী বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। তথাকথিত প্রগতিশীলদের ধারণায় যেটা প্রগতির অন্তরায়। আমরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে যে বিচার ব্যবস্থা পেয়েছি তাতে বিচারকাজ খুবই জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। অপরাধী হাতেনাতে ধরা পড়লেও সহজে তার শাস্তি হয় না। তাৎক্ষণিক অপরাধ অস্বীকার করতে না পারলেও পরবর্তীতে সে কথা ঘুরিয়ে ফেলে। এর সাথে যুক্ত রয়েছে ওকালতি পদ্ধতি। নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর অপরাধীও সেরা উকিল পেয়ে যায়। কালক্ষেপণের সাথে সাথে বাড়তে থাকে দুর্নীতি ও কালোটাকার খেলা।ইসলামী বিচার ব্যবস্থা ও প্রচলিত মানবরচিত বিচার ব্যবস্থার পার্থক্য হিসাবে আমরা সঊদী আরবের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারি। যানবাহন দুর্ঘটনাজনিত অপরাধসহ অন্য সকল প্রকার অপরাধ প্রবণতার হার সারা বিশ্বে কেবল বেড়েই চলেছে। আমাদের দেশেও অপরাধ প্রবণতা ক্রমবর্ধমান অবস্থায় রয়েছে। এমতাবস্থায় সঊদী আরবে সকল প্রকার অপরাধ প্রবণতার হার হ্রাস পাওয়া সত্যিই একটি বিস্ময়কর খবর বৈকি। সঊদী আরবে অপরাধের সংখ্যা কম হবার পেছনে যে দু'টি বিষয় কাজ করেছে। তন্মধ্যে একটি হ'ল, সেখানে কুরআনের আলোকে প্রচলিত অপরাধ দমনের বিজ্ঞানসম্মত আইন, অপরটি সে আইনের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান সেখানে যতটুকু চালু আছে তার যথাযথ প্রয়োগ। এর সুফল প্রমাণ করে যে, কোন দেশে ইসলামী জীবন বিধান চালু থাকা এবং এর যথাযথ প্রয়োগ সমাজ থেকে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস বা নির্মূলে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। আইন শত ভাল হ'লেও তার যথাযথ প্রয়োগ না হ'লে তাতে আইন প্রণয়নের লক্ষ্য অর্জিত হয় না। অনেকেই আবার চোরের হাত কাটা ও ধর্ষকের বেত্রাঘাতের মত প্রকাশ্য শাস্তিদানের বিধিকে অমানবিক বলে অভিহিত করতে চান। তারা সুযোগ পেলেই এর বিরোধিতা করেন। তাদের ব্যাপারটা একান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত। আসলে তারা অপরাধের ফলে সৃষ্ট মানুষের দুঃখ-বেদনা ও ক্ষতির

চাইতে শাস্তিকেই যেন বেশী খারাপ চোখে দেখেন। এটা তাদের এক প্রকার অপরাধ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ কি-না জানি না, তবে আল্লাহর দন্ডবিধির পেছনে যে মানবিক তাৎপর্য রয়েছে তা থেকে তারা চোখ বন্ধ করে রাখেন। কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে আসলে আল্লাহ রাববুল আলামীন অপরাধের বিলোপ করতে চেয়েছেন। যা সুস্থ সমাজ ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য অপরিহার্য।

অন্যদিকে নিরীহ বিবাদী মামলা ও উকিলের খরচ বহন করে নিঃস্ব হ'তে থাকে। আল্লাহর দন্ডবিধান অনুপস্থিত বলেই আমাদের জীবন এবং সমাজে আজ অশান্তি, আতঙ্ক ও চরম নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে। দয়াময় আল্লাহ, সরকার, প্রশাসন ও জনগণকে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন।-আমীন!